দাম : ষোলো টাকা

বাংলাস্তানের স্বপ্ন দেখিয়ে বাংলা ভাষা বিলোপের চেষ্টা কারা করছে? — পৃঃ ১১

স্বস্তিকা

সাম্প্রতিক অভ্যুত্থান লক্ষ্য ইসলামিক বাংলাস্তান— পৃঃ ১৩

৭৭ বর্ষ, ২ সংখ্যা।। ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।। ১৬ ভাদ্র, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

বাংলাদেশে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ?

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ২ সংখ্যা, ১৬ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

২ সেপ্টেম্বর - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

তদন্তে কি বাদ পড়ছেন মমতা, নিগম আর গোয়েল? শক্তিরূপেণ সংস্থিতা □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

দিদির লোটা-কম্বল বেঁধে রাখাই ভালো

□ সুন্দর মৌলিক □ ৭

অপপ্রচারের সাজা জরিমানা

□ শ্রীরঙ্গ বাসুদেব পেণ্ঢারকর ও আমন ব্যাস □ ৮

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিরাপত্তা : আমেরিকার ওপর চাপ বাড়ালো ভারত □ বিশ্বামিত্র □ ১০

বাংলাস্তানের স্বপ্ন দেখিয়ে বাংলাভাষা বিলোপের চেষ্টা কারা করছে? □ প্রবীর ভট্টাচার্য □ ১১

সাম্প্রতিক অভ্যুত্থান : লক্ষ্য ইসলামিক বাংলাস্তান

□ বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায় □ ১৩

বাঁচার জন্য হিন্দুকে জাগ্রত থাকতে হবে

□ কল্যাণ গৌতম □ ১৬

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যা কতদিন পর্যন্ত সংখ্যালঘু থাকবে? □ বিপ্লব বিকাশ □ ১৮

বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার হ্রাস ও বিতাড়নের ধারাবাহিকতা

□ ধর্মানন্দ দেব □ ২৩

গ্রেটার ইসলামি বাংলাদেশের গোপন কথা □ প্রকাশ দাস □ ২৪

মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবীর অবদান এবং বর্ণময় জীবন

□ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী □ ৩১

বহু জনহিতকর কাজের জন্য মহাত্মা মতিলাল শীল চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন □ দীপক খাঁ □ ৩৩

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল সমস্যা এবং সমাধানের পথ

□ বাপী প্রামাণিক □ ৩৫

বাংলাদেশে হিন্দুদের পালটা স্লোগান—'কথায় কথায় বাংলা ছাড়, দেশটা কি তোর বাপ দাদার? □ সাধন কুমার পাল □ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ :

□ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৭-৩০ □ চিঠিপত্র : ৩৭ □ খেলা : ৩৮ □ অন্যরকম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৪৯

প্রকাশিত হবে ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

নৈরাজ্যের রাজ্য

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি বর্তমান সময়ে নৈরাজ্যের রাজ্যে পরিণত হয়েছে। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর জেলে, খাদ্য দপ্তর জেলে, স্বাস্থ্য দপ্তর জেলে যাওয়ার পথে। পুলিশ প্রশাসন দলদাসে পরিণত। রাজ্যের মানুষ এর থেকে পরিত্রাণ চাইছে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়েই আলোকপাত করবেন ড. পঙ্কজ কুমার রায়, সুদীপ্ত গুহ, দেবযানী ভট্টাচার্য, আনন্দমোহন দাস, দেবজিৎ সরকার প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জাগ্রত বাঙ্গালি

ছন্দের জাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার 'আমরা' কবিতায় ছত্রে ছত্রে বাঙ্গালি জাতির গৌরবগাথা বর্ণনা করিয়াছেন। কবিতা জুড়িয়া বাঙ্গালি জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিক্রম-পরাক্রম এবং সাংস্কৃতিক বিজয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সত্যিই, বাঙ্গালি একদিন বিশ্বের অগ্রগণ্য জাতি হিসাবে পরিগণিত ছিল। জাতীয় জাগরণের কালে বাঙ্গালিই নেতৃত্ব দিয়াছে ভারতবর্ষকে। বাঙ্গালির বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া সেইদিন মহামতি গোখলে বলিয়াছিলেন, বঙ্গ আজ যাহা ভাবিতেছে, অবশিষ্ট ভারত আগামীকাল তাহা ভাবিবে। সেই বাঙ্গালি জাতিকে হীনবীর্য করিবার মানসে সুচতুর ইংরাজ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ করিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালির বুদ্ধিমত্তা তথা সঙ্ঘবদ্ধতার পরিচয় পাইয়া অচিরেই ইংরাজদিগকে সেই বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা বাঙ্গালিকে শক্তিহীন করিবার চক্রান্ত ও প্রয়াস পরিত্যাগ করে নাই। ইতিহাস সাক্ষী, বাঙ্গালির পরাক্রমের ভয়েই তাহারা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা হইতে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করিয়াছে। বাঙ্গালিকে শক্তিহীন করিবার প্রয়াস শুধুমাত্র ইংরাজই করিয়াছে তাহা নহে। ইহাদেরও পূর্বে আরব মরুদস্যুদের প্রেরিত দরবেশ শাহজালাল এই প্রচেষ্টা করিয়াছে। ইসলামের পঞ্চমবাহিনীরূপে দরবেশ শাহজালালের এই বঙ্গভূমিতে আগমন। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ হিন্দুকে এই সুফি দরবেশই ইসলামে ধর্মান্তরিত করিয়াছে। পরবর্তীকালে এই ধর্মান্তরিত নব্য মুসলমানরাই অবশিষ্ট হিন্দুর জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গ-সহ সমগ্র বঙ্গভূমিকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিবার কৌশল করিয়াছিল জিন্না। তাহার কৌশলে প্রভাবিত হইয়াছিলেন বঙ্গভূমির কয়েকজন হিন্দু নেতাও। কিন্তু ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দূরদর্শিতায় তাহাদের সেই অভিসন্ধি কার্যান্বিত হইবার সুযোগ পায় নাই। তিনি পাকিস্তানের গ্রাস হইতে বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে ছিনাইয়া আনিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষার ভূমি পাইলেও পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা নিজভূমেই পরবাসী হইয়াছেন। স্বাধীনতার পূর্ব হইতেই তাহারা অপমানিত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে তাহারাই মূল বলিদানকারী। তাহা সত্ত্বেও স্বাধীন বাংলাদেশে তাহাদের উপর অত্যাচারের মাত্রা কোনোভাবেই হ্রাস হয় নাই। যে কোনো অজুহাতে জেহাদিরা তাহাদের সম্পত্তি জবরদখল, হত্যা, ধর্মান্তরণ, মাতা-ভগিনীর সম্ভ্রমহানি, দেবালয় চূর্ণ করিয়াছে। স্বাধীনতার পর হইতে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাইতে পাইতে তাহা ৮ শতাংশের নীচে নামিয়াছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের লক্ষ্য যে হিন্দু বিতাড়ন তাহাও পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। একটি নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করিয়া তাহারা বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য দেশে পরিণত করিতে চায় তাহাও দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। এই অবকাশে তাহারা বহু স্থানে হিন্দুদের উপর আক্রমণ সংঘটিত করিয়াছে। বহু দেবালয় ও সম্পত্তি ধ্বংস করিয়াছে। বেশ কয়েকজন হিন্দুকে হত্যা করিয়াছে। সরকারি বেসরকারি চাকুরি হইতে শতাধিক হিন্দুকে বরখাস্ত করিয়াছে। এই ঘৃণ্য ঘটনার প্রতিবাদে অবশ্য ভারত-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধিক্কার উঠিয়াছে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদেরও ইহাতে সংবিৎ ফিরিয়াছে। বহু বৎসর পর এই প্রথম তাহারা স্বীয় অধিকারের দাবিতে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাহাদের এই প্রচেষ্টাকে বিশ্ববাসী সাধুবাদ জানাইয়াছে।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানকারী জনতাকে ধিক্কার জানাইতে হয়। যেইভাবে তাহারা আন্দোলন সংগঠিত করিয়াছে তাহা মধ্যযুগের বর্বতাকেও হার মানাইয়াছে। এই অভ্যুত্থানকে তাহারা তাহাদের পুনরায় স্বাধীনতা অর্জন বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। প্রশ্ন উঠিয়াছে, কতবার তাহারা স্বাধীনতা অর্জন করিবে? পাকিস্তানের নিকট হইতে স্বাধীন হইয়া পুনরায় কি তাহারা পাকিস্তান অথবা চীনের নিকট পরাধীনতা স্বীকার করিবে? চিন্তার বিষয় হইল, তাহারা বাংলাদেশকে বৃহত্তর ইসলামিক বাংলাস্তানে পরিণত করিতে চলিয়াছে। আরও চিন্তার কারণ হইল, তাহাদের ইসলামিক বাংলাস্তানের পরিকল্পনার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, বিহার, ঝাড়খণ্ডের অংশ রহিয়াছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমেও সেই আশঙ্কাই করা হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় হইল, পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত ভোটভিখারি রাজনৈতিক দলগুলির ইহাতে কোনো হেলদোল পরিলক্ষিত হইতেছে না। বামপন্থীরা তো বাংলাদেশের অভ্যুত্থানকারীদের সমর্থনে কলকাতার রাজপথে মিছিল করিয়াছে। রাজ্যের শাসকদলের কেউ কেউ তাহাতে উল্লসিত হইয়া সমাজমাধ্যমে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের এক মন্ত্রী তো পূর্বেই কলকাতার বুকে বেশ কয়েকটি মিনি পাকিস্তান সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগের পৃষ্ঠদেশ দেওয়ালে ঠেকিয়া গিয়াছে বলিয়া তাহারা ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদিগের অবস্থা পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুদের অপেক্ষা কোনো অংশে কম নহে। ভোটভিখারি রাজনৈতিক দলগুলির এই বিষয়ে কোনাপ্রকার উচ্চবাচ্য নাই। একমাত্র রাষ্ট্রবাদী দলটি মানুষকে সচেতন করিয়া চলিয়াছে। আর তাহাতে মানুষও সচেতন হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুদিগের মধ্যে এক জাগরণ পরিলক্ষিত হইতেছে, ইহা নিশ্চিতভাবে একটি শুভ লক্ষণ।

সুভাষিতম্

পরোক্ষে কার্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।
বর্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্।। (হিতোপদেশ)

পরোক্ষে কার্য বিঘটনকারী এবং প্রত্যক্ষে প্রিয়ভাষণকারী মিত্রকে সর্বদা বর্জন করা উচিত। কেননা তারা উপরিভাগে দুধ থাকা বিষকুম্ভের সমান।

তদন্তে কি বাদ পড়ছেন মমতা, নিগম আর গোয়েল?

শক্তিরূপেণ সংস্থিতা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

সুপ্রিম আদালতে রাজ্য সুপ্রিম বা সর্বোচ্চ থাপ্পড় খেয়েছে। আচার্য চাণক্য বলেছিলেন অবিচারে মত্ত শাসকের অপসারণই মৃত্যুদণ্ড। আরজি করের নারকীয় ঘটনায় তাঁর কোনো লেনাদেনা নেই বলে দায় সেরেছেন মমতা। গভীর স্বার্থ না থাকলে এরকম লজ্জার ঘটনার দায় ঝেড়ে ফেলা যায়?

বলা হয় কিছু রাজনৈতিক ব্যবসায়ী আর স্বার্থপরের লেজুড় মমতা। তাই পুলিশ আর স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদ ছেড়ে সরে দাঁড়ানোটা তাঁর কাছে যেমন নির্মম পরাজয় তার থেকেও বেশি স্বার্থবাহী অসাধু আপনজনদের বাঁচিয়ে রাখা। দিবাস্বপ্নের মতো যদি এটা ধরে নেওয়া যায় যে মমতা নির্দোষ তাও জনমানসে তথ্য প্রমাণ লোপাটকারী আর মিথ্যাবাদী হিসেবে তার চরিত্র কিছুমাত্র কম কলুষিত হয় না।

একসময়ের রাজনৈতিক অন্যায়ের শিকার মমতা এখন নিজেই শিকারি। মমতা অন্যায়বাদী। অন্যায়কে ব্যবহার আর চালনা করে রাজ্য চালান। মনে করেন ন্যায়ের নৌকো বেশি দূর যেতে পারে না কারণ তা ধীরে চলে। তাই অন্যায়কে বাঁচিয়ে রেখে প্রশাসন চালানো উচিত। লুকানো কাদা কেউ দেখতে পায় না। তেরো বছর ধরে এই রাজ্যে চুরি, খুন, নারী নির্যাতনের কোনো হিসাব নেই। তাই জাতীয় পুলিশ রেকর্ডের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিরাপদ রাজ্য হিসাবে স্থান পায়।

আরজি করে 'আমার কন্যা অভয়া'-র উপর যে অন্যায় হয়েছে মমতার বুদ্ধি উপলব্ধিতে তা কুলোবে না। পঙ্গপাল আমলা আর পরামর্শদাতার দল তার থেকে ফায়দা তুলতেই ব্যস্ত। মমতা যত দুর্বল হবে ওদের ব্যবসা তত বাড়বে। ওরা মমতাকে পোকায় খাওয়া রাজা বানাবে। ওই আহাম্মকদের বুদ্ধিতেই তথ্য লোপাট করতে ১৪ আগস্ট রাতে আরজি করে হামলা হয়। প্রমাণ হয় মমতার জমানার অন্যতম বড়ো লজ্জা আর কলঙ্ক হাপিস করার চেষ্টা। চাণক্য বলেছিলেন অমাত্যরা গোরুর মতো। গণ্ডির বাইরে যেতে চায় না। চাণক্যের বাক্য মেনে নিলে গোরুরাই এখন মমতাকে চালান। ফল যা হবার তাই হচ্ছে। দালাল আমলা থেকে দুষ্ট কোতোয়াল মমতাকে ঘিরে ফেলেছে।

গোদের উপর বিষফোঁড়া পরিবারের এক নেতা। দাবি উঠেছে, মমতা, স্বাস্থ্যসচিব এনএস নিগম আর নগরপাল বিনীত গোয়েলকে কেন জেরা করা হবে না। তাদের কথোপকথনের রেকর্ডের কেন তদন্ত হবে না। পুলিশ আর তথ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতাকেই আরজি করের দায় নিতে হবে। 'লেনা-দেনা নেই' বলে পালিয়ে গেলে চলবে না।

পশ্চিমবঙ্গ এখন বিশৃঙ্খলার বাসস্থান। ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারী শক্তিদায়িনী শক্তিরূপা। সেই প্রকাশ বহুমাত্রিক। তা যে কোনোভাবেই প্রকাশিত হতে পারে। ছাত্র বা যুব আন্দোলন বা সামাজিক আন্দোলন হিসেবে। রাজ্যজুড়ে মানুষের মধ্যে মমতা-বিরোধী আর বিচারের দাবিতে যে স্বতঃস্ফূর্ততা দেখা যাচ্ছে তা মমতা রাজ্যের ঠুনকো শক্তির চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী। অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে মানুষ সে আন্দোলনকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন সব কষ্ট সহ্য করেও। এ আন্দোলন আর প্রতিবাদ মমতা বা তাঁর নেতারা কোনোদিন দেখেনি। দলীয় স্বার্থপরতার রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা মমতাকে আজ তাই দিশেহারা দেখাচ্ছে। সমানে ভুল করে চলেছেন, যার মধ্যে রয়েছে পদ আঁকড়ে থাকা। 'অতি দর্পে হতা লঙ্কা, অতি মানে চ কৌরবা।' শুধু সময়ের অপেক্ষা।

নারীর লাঞ্ছনা এই সংস্কৃতিতে বরদাস্ত নয়। তবুও বিভিন্ন যুগে ও কালে নারীর উপর নেমে এসেছে চরম অশ্রদ্ধা আর অত্যাচার। ইবসেনের ডলস হাউস নাটকের পর নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ী বলেছিলেন ভারতের নারীরা পুতুল নয়। তারা দাসী, আর সেই দাসত্ব ঘোচাতে হবে। তবেই জাতির উন্নতি। স্বামী বিবেকানন্দ একটি জাতির উন্নতির মাপকাঠি হিসেবে নারী মুক্তিকেই রেখেছিলেন। অথচ এখন তা অপ্রকট। সেই শক্তির রূপ ধরেই আরজি কর হাসপাতালে প্রতিরোধের আগুন মমতাকেও ছুঁয়ে ফেলবে।

সামনে দুর্গাপূজা তাই শ্রীঅরবিন্দের দুর্গাস্তোত্র দিয়েই লেখা শেষ করলাম আমার কন্যা অভয়াকে উৎসর্গ করে। 'মাতঃ দুর্গে। বীরমার্গ প্রদর্শিনী তুমি। তোমার মন্ত্র হোক যন্ত্র। তব অশুভ বিনাশী তরবারি হোক প্রকাশিত।' এই রাজ্যে কন্যা অভয়ার আত্মা বহ্নিমান। আমরা তার আঁচ পাচ্ছি। এই রাজ্যের পার্কস্ট্রিট, কামদুনি, মধ্যমগ্রাম, হাঁসখালি, কালিয়াগঞ্জ, আর জি করের অভয়াদের মুক্ত আত্মার মিলনেই মিলিত প্রতিবাদ। □

দিদির লোটা-কম্বল বেঁধে রাখাই ভালো

ভীতসন্ত্রস্তষু দিদি,

জানি আপনি ভয় পেয়েছেন। এই ভয় অকারণে নয় দিদি। দিনের পর দিন যত যত অন্যায় হয়েছে আপনার আমলে এবং যত অনাচারকে ছোটো করে দেখা হয়েছে তারই পরিণতি। সত্যিই দিদি, পশ্চিমবঙ্গে দিনবদলের সময় এসেছে। দিদি, আমি জানি আপনি বাম আমলের কথা বলবেন। তাদের তো জবাব জনগণই দিয়েছে। কিন্তু সেবার আন্দোলন তৈরি হয়েছিল আপনার মদতে। কিন্তু দিদি এই যে জনরোষ দেখছেন সেটায় কোনও রাজনৈতিক ইন্ধন নেই। আপনি সেটা বুঝছেন। যতই রাম-বাম জুজুর কথা বলুন আসলে কিন্তু আপনিও জানেন সত্যটা কী। আপনার দলেরও সবাই জানেন। তাই দেখুন, এক জেলখাটা আসামি কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থে কথা বলা ছাড়া আপনার হয়ে বলার কেউ নেই। আপনার ভাইপো মেঘনাদের মতো আড়াল থেকে টুইট করা ছাড়া আর কিছুই করছে না। একটি বারের জন্য আপনার হয়ে কথা বলেনি এই পর্বে।

দিদি, একটা কথা মনে রাখবেন, শব্দই ব্রহ্ম। আর সেই ব্রহ্ম নানা প্রসঙ্গে নানা রূপে প্রকাশিত হয়ে থাকেন। আপনি কথায় কথায় বলেন, 'জনতার আদালত' বিচার করবে। বিভিন্ন নির্বাচনের উদাহরণ দিয়ে আপনি বলতেই পারেন সেই আদালত আপনাকে পাশ করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তা একমাত্র সত্য নয়। যত মানুষ আপনাকে সমর্থন দিয়েছেন প্রায় সমান সংখ্যক মানুষই আপনাকে বর্জন করেছেন। এখন সেই সংখ্যাটা প্রতিদিন বাড়ছে। আপনি ভেবেছিলেন, ভোটে যদি জয় পাই, তবে সাত কেন, সাতশো খুনও মাপ। কিন্তু তা একমাত্র সত্য নয়। জনতা সর্বদা সেই তত্ত্ব মেনে নেয় না। তারা মাঝে মাঝেই নিজস্ব অভিধান হাতে তুলে নেয়। এখন সেই অভিধানের পাতা উলটে নিক্ষেপ করা চলছে জনতার আপন শব্দবাণ, ভোটযুদ্ধে বিজয়ী শাসকের গর্বিত মুখের উপর সপাটে জানিয়ে দিচ্ছে, এই অন্যায় অনাচার চলবে না!

খাস কলকাতায় মহিলা চিকিৎসকের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরে প্রথমে মহানগরে এবং তার পরে রাজ্যের সর্বত্র যে জনজাগরণ দেখা যাচ্ছে, তার সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একটাই মিল। সকলেই বলছেন, অন্যায় অবিচার চলবে না। বিভিন্ন বর্গের, বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন মতের নাগরিক ক্রমাগত এক হয়ে সমস্বরে 'ন্যায়বিচার চাই' ধ্বনি তুলেছেন।

সময় যত বাড়ছে সেই প্রতিবাদও বাড়ছে। জনতার আদালতে বিচার শুরু হয়ে গিয়েছে। জনতা বিচার করার পথে না হেঁটে বিচার চাইছে। সঙ্গে সঙ্গে সময় মতো বিচার করার সিদ্ধান্তও নিয়ে রাখছে। দিদিগো, আমি শুনতে পাচ্ছি সেই আওয়াজ। ১৮ থেকে ৮১ বলছে— 'তোমার বিচার করবে যারা, আজ জেগেছে সেই জনতা।'

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, দুর্গার ভাণ্ডার দিয়ে ব্যক্তি এবং পরে সংগঠনকে বগলদাবা করতে চান। কিন্তু এখন আর সে সবকে তোয়াক্কা করছে না কেউ । আপনার মাসিক এক হাজার টাকা কিংবা পূজায় ৮৫ হাজার যে জনতার টাকা জনতাকে দেওয়া তা সবাই বুঝে গিয়েছে। সেই অর্থ নেওয়ার প্রতি অনীহা বাড়ছে। শুরু হয়ে গিয়েছে প্রত্যাখ্যান ।

গত দুই সপ্তাহ ধরে রাজ্যজুড়ে যে বিদ্রোহের স্রোত তাতে অনেকেই ভয়ে আসেননি এখনোও। অনেকে অপবাদের আশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার জন্য এসেছেন। কিন্তু সেই সংখ্যা খুবই কম। মিছিল দেখে, মিছিলে থেকে বলছি দিদি, এই স্রোতকে কখনোই তুচ্ছ করা চলে না। এই সামাজিক উদ্যোগে বহু সচেতন নাগরিকের যে আন্তরিক যোগদান তাকে ছোটো করে দেখা ঠিক হবে না দিদি। এর পিছনে ব্যক্তিগত ক্ষোভ ও যন্ত্রণার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং শাসনক্ষমতার অধীশ্বরী মানে আপনার কাছে সুবিচারের দাবিতে যাঁরা সমবেত হয়েছেন এবং হচ্ছেন তাঁদের নিজের নিজের জীবনে অন্যায় অবিচারের অনেক অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু তাঁরা যখন একটি বিরাট অন্যায়ের ঘটনায় ক্ষোভে ও ক্রোধে ফেটে পড়েন, তখন সেই সম্মিলিত প্রতিবাদের মধ্যে, প্রত্যেকের সেই ব্যক্তিগত জীবনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও নিহিত থাকে। তাই এটাকে 'মহাবিদ্রোহ' মনে করুন।

আপনার কাছে অবশ্য ব্যক্তিমানুষের দাম কেবলমাত্র তাঁর ভোট দিয়েই নির্ধারিত হয়। সেই দাম বুঝে নেওয়ার জন্য আপনি ব্যক্তিকে জনতার অংশ করে নেন। ধর্ম দিয়ে, জাত দিয়ে ভাগ করে দেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, দুর্গার ভাণ্ডার দিয়ে ব্যক্তি এবং পরে সংগঠনকে বগলদাবা করতে চান। কিন্তু এখন আর সে সবকে তোয়াক্কা করছে না কেউ দিদি। আপনার মাসিক এক হাজার টাকা কিংবা পূজায় ৮৫ হাজার যে জনতার টাকা জনতাকে দেওয়া তা সবাই বুঝে গিয়েছে। সেই অর্থ নেওয়ার প্রতি অনীহা বাড়ছে। প্রত্যাখ্যান শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই প্রত্যাখ্যানে আমি আপনাকে বর্জন করার ইঙ্গিত পাচ্ছি।

তাই দিদি, লোটা-কম্বল বেঁধে রাখাই ভালো পরিস্থিতি ভালো বুঝছি না।

অপপ্রচারের সাজা জরিমানা

ভারতের অতি পরিচিত তথাকথিত সমাজসেবী মেধা পাটেকর এবং তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ সাকেত গোখলে সম্প্রতি বিচারবিভাগের থেকে কড়া বার্তা পেয়েছেন। মেধা পাটেকরকে ৫ মাসের কারাদণ্ড এবং ১০ লক্ষ টাকা জরিমানার সাজা শুনিয়েছে দিল্লির সাকেত আদালত। সাকেত গোখলেকে ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করেছে দিল্লি হাইকোর্ট। আদালতের তরফে গৃহীত এই পদক্ষেপ তাদের প্রতি একটি কড়া শিক্ষা যারা নিজেদের স্বার্থরক্ষায় মিথ্যের বেসাতি করে। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তারা যে কারুর দুর্নাম রটাতে পারে, যে কারুর ভাবমূর্তিতে কলঙ্ক লেপনে সচেষ্ট হতে পারে।

দিল্লির বর্তমান লেফটেন্যান্ট গভর্নর বিনয় কুমার সাক্সেনার তরফে দায়ের করা একটি মানহানির মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন মেধা পাটেকর। বিনয় সাক্সেনা যখন 'ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সিভিল লিবার্টিজ'-নামক আমেদাবাদ-স্থিত একটি বেসরকারি সংস্থার প্রধান ছিলেন, তখন এই মামলার সূত্রপাত। সেই সময় মেধা পাটেকর এবং মেধার নেতৃত্বাধীন নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিনয় সাক্সেনা একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। সেই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে মেধা পাটেকর একটি মামলা দায়ের করেন। এতেই থামেননি মেধা। ২০০০ সালের ২৫ নভেম্বর বিনয় সাক্সেনার বিরুদ্ধে তিনি একটি বয়ান জারি করেন। সেই বিবৃতিতে মেধা পাটেকর দাবি করেন যে হাওয়ালা চক্রের মাধ্যমে বেআইনি লেন-দেনের সঙ্গে বিনয় সাক্সেনা যুক্ত। এছাড়াও তিনি বিনয় সাক্সেনাকে 'কাপুরুষ' বলে অভিহিত করেন। বিদেশি স্বার্থ চরিতার্থ করতে গুজরাটের সাধারণ মানুষ ও প্রাকৃতিক সম্পদকে বন্ধক দেওয়ার অভিযোগ সাক্সেনার বিরুদ্ধে তোলেন মেধা। মেধা পাটেকরের দেওয়া এই বয়ান ছিল বিনয় সাক্সেনার সৎ ভাবমূর্তির উপর সরাসরি আঘাত। মেধা পাটেকরের দেওয়া এই বয়ানের প্রতিক্রিয়ায় বিনয় সাক্সেনা ২০০১ সালে আমেদাবাদের একটি আদালতে মেধার বিরুদ্ধে অপরাধমূলক মানহানির (ক্রিমিনাল ডিফেমেশন) মামলা দায়ের করেন। এই মামলাটিকে ২০০৩ সালে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করে সুপ্রিম কোর্ট। দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকে এই মামলা। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বিনয় সাক্সেনা সম্পর্কে মেধা পাটেকর দ্বারা প্রকাশিত বিবৃতি সাক্সেনার প্রতি চরম অসম্মানজনক। তার সঙ্গে তাঁর ভাবমূর্তি, সুনাম ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার পক্ষেও হানিকারক। মেধার এই বিবৃতি অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল বলেও তার পর্যবেক্ষণে জানায় আদালত। বাস্তবিকই, বিনয় সাক্সেনার বিরুদ্ধে সর্বসমক্ষে মেধা পাটেকরের আনা অভিযোগগুলি ছিল ভিত্তিহীন এবং আদালতে সেগুলি প্রমাণেও তিনি ব্যর্থ হন। সাজা ঘোষণার পর মেধা পাটেকর বলেন যে সত্য কখনও পরাজিত হয় না। এই রায়কে উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হবে। হয়তো জেদ ও দম্ভের কারণেই মেধার এই সাজা প্রাপ্তি! তিনি চাইলে প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থনা করে এই মামলার অবসান ঘটাতে পারতেন, কিন্তু তিনি সেই রাস্তায় হাঁটেননি। এর পাশাপাশি এই মামলার ক্ষেত্রে শ্রীসাক্সেনাও উদারতার নিদর্শন রাখেন। তাঁর উকিলের মাধ্যমে আদালতকে জানান যে সম্মানহানির ক্ষতিপূরণ বাবদ কোনো অর্থ তিনি দাবি করছেন না। মেধা পাটেকরের থেকে আদায় হওয়া জরিমানার অর্থ দিল্লি স্টেট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটিতে জমা করার প্রস্তাব আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে তিনি পেশ করেন। এই প্রস্তাবের ক্ষেত্রে আদালত জানায় যে মামলা দায়েরকারী অর্থাৎ বাদীপক্ষকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। তারপর শ্রীসাক্সেনা তাঁর ইচ্ছানুসারে সেই অর্থদানের বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে পারেন বলে জানায় আদালত।

অতিথি কলম

শ্রীরঙ্গ বাসুদেব পেন্টারকর ও আমন ব্যাস

দেশবিরোধী এনজিওগুলির নয়নের মণি হলেন মেধা পাটেকর। ভারত-বিরোধী বেসরকারি সংস্থাগুলির কাছে 'আদর্শ' এই তথাকথিত সমাজকর্মী সর্বদা নানারকম বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে থাকেন। এই কারণে কিছু লোক তাকে বিতর্কিত 'মেধা' হিসেবেও আখ্যা দিয়ে থাকেন। দু'বছর আগে মধ্যপ্রদেশের জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল বড়ওয়ানিতে মেধা পাটেকর এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগে একটি এফআইআর দায়ের হয়। প্রীতম বড়োলে নামক একজন স্থানীয় ব্যক্তি অভিযোগ জানান যে জনজাতি পরিবারের সন্তানদের শিক্ষাদানের জন্য সংগৃহীত কোটি কোটি টাকা গরিব শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয় না করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে আন্দোলন সংগঠিত করতে খরচ করা হয়েছে। পুলিশ জানায় যে অভিযোগকারী ব্যক্তি তাঁর আনা অভিযোগের সপক্ষে কিছু নথিপত্র পেশ করেছেন। গোটা বিষয়টি তদন্তের আওতায় রয়েছে। মেধা পাটেকর এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিলেও তদন্ত শেষ হলেই এই ঘটনার পিছনে লুকিয়ে থাকা সত্য সামনে আসবে এবং গোটা বিষয়টি সেক্ষেত্রে স্পষ্ট হবে। অভিযোগকারীর দাবি হলো মহারাষ্ট্রের নন্দুরবারে মেধা পাটেকরের এনজিও দ্বারা 'জীবনশালা' নামক একটি বিদ্যালয় পরিচালিত হয় বলে তাদের জানানো হয়। সেই বিদ্যালয়ে জনজাতি পরিবারের গরিব শিশুদের লালনপালন এবং তাদের বড়ো করে তোলার কথা তাদের বলা হলেও বাস্তবে সেই এলাকায় এরকম কোনো বিদ্যালয়ের অস্তিত্বই নেই। অভিযোগকারী জানিয়েছেন যে মেধা পাটেকরের নেতৃত্বাধীন এনজিও-র দ্বারা সংগৃহীত অর্থ দেশ জুড়ে উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণে বাধাদান এবং দেশব্যাপী উন্নয়নযজ্ঞকে

রুখে দিতে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বহু বছর ধরেই নর্মদা নদীর উপর নির্মীয়মাণ সর্দার সরোবর-সহ অন্যান্য বাঁধ প্রকল্পগুলির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন করে চলেছেন মেধা পাটেকর। নদীর উপর নির্মিত বাঁধ প্রকল্পগুলি সম্পর্কে তিনি এমন একটি ধারণা তৈরি করেছিলেন যা ছিল তথ্য-আধারিত হওয়ার পরিবর্তে পুরোপুরি অনুমান ভিত্তিক। মেধা পাটেকরের আন্দোলন এক অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, যার ফলে সর্দার সরোবরের মতো জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের কাজ বহু বছর ধরে বাধাপ্রাপ্ত হয়। বহুবছর ধরে জলসংকটের সম্মুখীন গুজরাটের কচ্ছ এলাকা আজ সর্দার সরোবর প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত জলের ধারায় প্রতিনিয়ত ধৌত হয়ে চলেছে। এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হওয়ার সঙ্গে কৃষিজমিগুলিও সেচসেবিত হয়ে উঠেছে। কৃষকরা তাঁদের জমিতে পর্যাপ্ত জলসেচের সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। সেচযুক্ত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থিক উন্নতি ঘটায় কৃষিপ্রধান এই অঞ্চলগুলির মানুষের জীবনশৈলীতেও পরিবর্তন এসেছে। কৃষিকাজে অগ্রগতির দরুন বর্তমানে তারা উন্নতমানের জীবনযাপন করছেন।

মেধা পাটেকর এবং তাকে মদত দিয়ে চলা দেশবিরোধী, সেকুলার শক্তি দু'দশক ধরে পরিবেশ সংরক্ষণ ও মানবিকতার নামে দেশকে এমন এক ভ্রমজালে মুড়ে ফেলেন যে তার ফলে বিভ্রান্তির শিকার হন বহু মানুষ। এই কারণে ১৯৮৯ সালে যে প্রকল্পের নির্মাণকাজ শুরু হয়, ২০১৭ সালে তা সমাপ্ত হয়ে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। স্বনামধন্য সাংবাদিক ও কলাম লেখক স্বামীনাথন আঙ্কলেসারিয়া আইয়ার তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধে তুলে ধরেন তাঁরই একটি স্বীকারোক্তি। এই প্রবন্ধে লেখেন যে মেধা পাটেকরের অনবরত অপপ্রচারে তিনিও সেই সময় বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। সর্দার সরোবর প্রকল্পের উপযোগিতা বিষয়ে প্রশ্ন তুলে মেধা পাটেকরের অনুমান ছিল যে কচ্ছের মতো শুখা ও ঊষর অঞ্চলে এই প্রকল্পের জল কোনো দিনও পৌঁছাবে না। তার এই অনুমান পরবর্তীকালে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন যে মেধার গড়ে তোলা আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া কিছু মানুষ, সর্দার সরোবর প্রকল্পের জন্য যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। এই মানুষগুলির জীবনজীবিকা নাশের সম্ভাবনার বিষয়টিকে ব্যাপক ভাবে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসেন মেধা পাটেকর। তার সেই অপপ্রচারের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে দেখা যায় যে কিছুদিনের জন্য সেই মানুষগুলি ভূমিহীন হলেও বর্তমানে নানা সুযোগসুবিধা লাভের দরুন তাঁরা ভালোভাবেই জীবনযাপন করছেন। অন্য একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে মেধা পাটেকরের এনজিও বড়ো অঙ্কের অর্থ লাভ করেছে যার কোনো রকম হিসাব নেই। একবার বিদেশ থেকে এক দিনে এই এনজিও-র তরফে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। ঘটনাটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কারণ এই ক্ষেত্রে একই দিনে ২০টি পৃথক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এই এনজিও-র অ্যাকাউন্টে একই পরিমাণ অর্থ প্রেরিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন অ্যাকাউন্ট নম্বর হলেও, ওই দিন প্রতিটি অ্যাকাউন্ট থেকে মেধা পাটেকরের এনজিও-র অ্যাকাউন্টে '৫,৯৬,২৬৪ টাকা' পাঠানো হয়েছিল।

সংগৃহীত অর্থের অপব্যবহার

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের প্রভাব যে অঞ্চলগুলিতে পড়েছিল, বেশ কিছুদিন ধরে সেই এলাকাগুলিতে মেধা পাটেকরের বিরুদ্ধে ধূমায়িত হচ্ছিল জনরোষ। স্থানীয় বাসিন্দদের বক্তব্য হলো মেধা পাটেকরের এনজিও-তে যে দান বাবদ যে বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা পড়ে, ভারত-বিরোধী তথা হিন্দু-বিরোধী কার্যকলাপে তা ব্যবহার করে চলেছেন মেধা পাটেকর। দেশবিরোধী প্রতিটি আন্দোলনে মেধা পাটেকরের যোগদানের ঘটনা এই বক্তব্যটির সত্যতা প্রমাণ করে। হিন্দুদের উপর জেহাদিদের আক্রমণ এবং সেই আক্রমণকারী জেহাদি ও অপরাধীদের প্রতি তার সমর্থন— প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে অনেক কিছুই তুলে ধরে। ভারতের সংসদে যখন সিএএ বা নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন পাশ হয়, তখন সেই আইনটিকে সমর্থন জানিয়ে দিল্লিনিবাসী বহু মানুষ একটি র‍্যালির আয়োজন করে। সেই র‍্যালিতে পৌঁছে মেধা পাটেকর এই আইনের বিরোধিতায় মুখর হন। তার দুরভিসন্ধি বুঝে যায় উপস্থিত জনতা। একই ভাবে ২০২২-এ মধ্যপ্রদেশে খরগোন ও সেন্ধওয়ায় হিন্দুদের উপর জেহাদিরা হামলা চালানোর পর মেধা পাটেকর সেখানে পৌঁছান এবং মুসলমানদের ঘরবাড়ি আক্রান্ত হয়েছে বলে দাবি করে তাদের সমর্থন ও ইন্ধন জানান। ইন্দোরের নিকটে মুসলমান-অধ্যুষিত চন্দনখেড়ী গ্রামে শ্রীরামজন্মভূমি নিধি সমর্পণ অভিযানরত ভক্তদের উপর জেহাদিরা প্রাণঘাতী হামলা চালানোর পর মেধা পাটেকর সেই গ্রামে পৌঁছেও আক্রমণের ঘটনার সঙ্গে অপরাধীদের প্রতি তার সমর্থন জানান।

সাকেতের প্রতি পাঠানো একটি কড়া সংকেত : বড়ো বড়ো কথা বলে বেড়ানো সাকেত গোখলে সম্প্রতি মানহানির একটি মামলায় রীতিমতো ফেঁসে গিয়েছেন। গত ১ জুলাই দিল্লি হাইকোর্ট একটি নির্দেশে জানায় যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীনস্থ একটি সংস্থার প্রাক্তন আধিকারিক লক্ষ্মী পুরীর বিরুদ্ধে অপমানজনক কোনো কিছু প্রকাশের ব্যাপারে সাকেত গোখলের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। তার কৃতকর্মের জন্য লক্ষ্মী পুরীর সম্মানহানির কারণে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ জমা করার নির্দেশ দেয় আদালত। বিচারপতি অনুপ জয়রাম ভম্ভানির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ তাদের দেওয়া রায়ে বলে, যদিও কোনো পরিমাণ অর্থই কোনো দিন কারুর সম্মানহানির ক্ষতিপূরণে সমর্থ নয়, তবুও সব দিক বিচার করে বাদীপক্ষকে ক্ষতিপূরণের এই অর্থ প্রদানের জন্য সাকেত গোখলের প্রতি নির্দেশ জারি করা হচ্ছে। রায় বেরোনোর ৮ সপ্তাহের মধ্যে তাকে এই অর্থ বাদীপক্ষের হাতে তুলে দিতে হবে। এর সঙ্গে সাকেত গোখলেকে তার এক্স-হ্যান্ডেলে লক্ষ্মী পুরীর প্রতি ক্ষমা চেয়ে একটি বয়ান পোস্ট করতে নির্দেশ দেয় দিল্লি হাইকোর্ট। ক্ষমা প্রার্থনা সংবলিত এই পোস্ট ছয় মাস পর্যন্ত এক্স-হ্যান্ডেল থেকে মুছে ফেলা যাবে না বলেও জানিয়ে দেয় আদালত।

আশা করা যাচ্ছে, মেধা পাটেকর ও সাকেত গোখলের শাস্তি ও জরিমানা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবেন, যারা অন্যের ওপর ভিত্তিহীন অভিযোগের মতো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত খারাপ কাজ করে চলেছেন।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিরাপত্তা : আমেরিকার ওপর চাপ বাড়ালো ভারত

গত ১৫ আগস্ট দেশের স্বাধীনতা দিবসের ভাষণেই বাংলাদেশে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তারপরেই তাঁকে ফোন করে সেখানে হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছেন বলে দাবি করেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস। গত ১৬ আগস্ট সোশ্যাল মিডিয়াতে একটি পোস্টে ইউনুসের তাঁকে ফোন করে এই নিশ্চয়তা দেওয়ার বিষয়টি জানিয়েছিলেন মোদী।

তবে বাংলাদেশের তরফে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার স্রেফ এই আশ্বাসবাণীতেই সন্তুষ্ট না থেকে ভারত তার কূটনৈতিক দৌত্য শুরু করে দিল। এর কারণ হিসেবে কূটনীতিজ্ঞরা মনে করছেন, নয়াদিল্লি ভালোভাবেই জানে বাংলাদেশ এখন মোল্লাবাদীদের দখলে। ইউনুস তাদের হাতের বোড় মাত্র। সুতরাং স্রেফ আশ্বাসবাণীতে ভারত ভুলবে না।

প্রসঙ্গত, অতীতে দেখা গিয়েছে বাংলাদেশের যে কোনো অভ্যন্তরীণ সমস্যার অজুহাতে সে দেশের হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ নেমে আসে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট ঢাকা ছাড়ার পর বাংলাদেশের ২৯টি জেলায় হিন্দুরা আক্রান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে সেদেশের হিন্দুদের সংগঠন। হিন্দুদের বাড়ি-ঘরে হামলা ছাড়াও মন্দির ও অন্যান্য ধর্মস্থানে ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। উন্মত্ত ইসলামি মোল্লাবাদীদের হাতে বেশ কিছু হিন্দুর প্রাণ গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বাংলাদেশে একাধিক ভারতীয় সংস্থায় বিপুল বিনিয়োগ রয়েছে হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের। সেই সব পরিকাঠামোর ওপরেও হামলা হয়েছে বলে খবর।

এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক কার্যকরী সভাপতি অলোক কুমার ভারত সরকারকে সতর্ক করে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশে যে অনিশ্চয়তা ও অরাজকতা চলছে তা ভারতের জন্য উদ্বেগের। এই মুহূর্তে আমাদের বাংলাদেশের জনতার পাশে থাকা উচিত। কিন্তু এই কোটা আন্দোলনে সেখানকার সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে হিন্দু ও শিখদের বাণিজ্যিক পরিকাঠামো, তাদের ঘর ও পূজাস্থল, মন্দির ও গুরুদ্বারে হামলা করে ক্ষয়ক্ষতি করা হয়েছে।

সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি, বাংলাদেশে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফেরাতে উদ্যোগী হোন। ভারত সরকারের কাছে সেখানকার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার আবেদন করেছি। এই অছিলায় যাতে ফের বড়োসড়ো অনুপ্রবেশ না ঘটে সেজন্য সীমান্তকে কঠোরভাবে সিল করা হোক। আমি প্রার্থনা করি বাংলাদেশে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাক।'

সেদেশের সংখ্যালঘুদের সংগঠন 'বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'ও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়। পরিষদের সভাপতি নব্যেন্দু বিকাশ দত্ত অভিযোগ করেন, 'প্রধানমন্ত্রিত্ব ছেড়ে শেখ হাসিনা দেশত্যাগের পরই শুরু হয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা। ওরা হিন্দু বাড়িতে আক্রমণ করে। জিনিসপত্র লুঠ করে। মন্দির ভাঙচুর করে। সারা দেশে প্রায় ৫০ জেলায় ওরা এমন বর্বরতা চালিয়েছে। আর এটা নতুন ঘটনা নয়। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও জনজাতিরা বারবারই আক্রান্ত হচ্ছে, যখনই কোনো নির্বাচনে সরকার পরিবর্তন হয় কিংবা অন্য কোনো কারণে সরকার উচ্ছেদ হয়, তখনই ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বর্বরতার শিকার হয়, তাদেরকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়।' এদিকে বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে আমেরিকার রাজধানী নিউইয়র্কে বিক্ষোভ কর্মসূচিরও আয়োজন হয়েছিল। সৌজন্যে 'ইউনাইটেড হিন্দুজ ইন ইউএসএ' নামক একটি সংগঠনে। ব্যানার-ফেস্টুন-প্ল্যাকার্ড হাতে সংখ্যালঘু নিপীড়নের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন প্রবাসীরা। নিউইয়র্কের ইউনিয়ন স্কোয়্যারে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচি থেকে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে চলে যাওয়ার পর বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে 'হামলা ও ভাঙচুরের' অভিযোগ করা হয়।

আয়োজক সংগঠনের চেয়ারম্যান প্রভাত দাস ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'বাংলাদেশে যখনই সরকার পরিবর্তন ঘটে তখনই হিন্দুরা আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হচ্ছি। সারা বিশ্বের হিন্দুরা আজ ঐক্যবদ্ধ। একই ভাষায় আমা কথা বলছি, বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর হামলা চালানো থেকে বিরত থাকুন।' মানবাধিকার সংগঠক দিলীপ নাথ বলেন, 'ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু জাদুঘর তছনছের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলার ঘৃণ্য প্রয়াস চালানো হয়েছে। একইসঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি-ঘরে হামলা, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে সংক্যালঘুহীন করার জঘন্য একটি চেষ্টা চালানো হচ্ছে।' দিলীপ আরও বলেন, 'দুর্বৃত্তরা এখনও তৎপরতা চালাচ্ছে। কিন্তু জাতিসঙ্ঘের তদন্ত দলকে বারবার বলা হচ্ছে ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সংঘটিত হিংসার ঘটনার তদন্ত করতে। আমরা দাবি জানাচ্ছি, তদন্তের পরিধি ৫ আগস্ট থেকে বাড়িয়ে ১৮ আগস্ট করা হোক। তাহলে সব হত্যাকাণ্ড, লুঠতরাজ ও ভাঙচুর-সহ হিংসার ঘটনায় জড়িতরা বিচারের আওতায় আসবে।'

এই অবস্থায় আমেরিকার ওপর চাপ বাড়াতে কূটনৈতিক কৌশল নিল ভারত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ২৬ আগস্ট জানিয়েছেন, তিনি টেলিফোনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে কথাবার্তার প্রসঙ্গে বাংলাদেশের কথা, বিশেষ করে হিন্দুদের নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলেছেন। মোদী সামাজিক মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে (পূর্বতন ট্যুইটার) দেওয়া এক বার্তায় বলেছেন, 'আমরা বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছি এবং সংখ্যালঘুদের বিশেষ করে হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে শীঘ্রই বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনের উপর জোর দিয়েছি'। মোদী আরও বলেন, তিনি এবং প্রেসিডেন্ট বাইডেন বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি ইউক্রেনে শান্তি ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ভারতের অবস্থানও তুলে ধরেন বলে জানিয়েছেন। □

বাংলাস্তানের স্বপ্ন দেখিয়ে বাংলাভাষা বিলোপের চেষ্টা কারা করছে?

প্রবীর ভট্টাচার্য

একত্রিশ বছর আগের এক ঘটনার কথা মনে পড়ছে। চৈত্রের শেষ রাতে কলকাতার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিরোনাম চমৎকার। 'বঙ্গাব্দের চতুর্দশ শতবর্ষ পূর্তি উৎসব'। নাম শুনেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, বাংলা ক্যালেন্ডারের চোদ্দশো বছর ত্যাগ করে চোদ্দশো এক বছরে পদার্পণের প্রাক্ মুহূর্ত। সারারাত সংগীত, নৃত্য, বাদ্য, আবৃত্তির উৎসব। যতদূর মনে পড়ছে আয়োজক কমিটির মাথায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম। আমন্ত্রণ পত্রে রয়েছে এপার ও ওপারের বাম মনোভাবাপন্ন প্রায় শিল্পী-সাহিত্যিকদের নাম। এছাড়াও আছেন সেই সময়ের এক আনন্দবাজারি সাংবাদিক ও এক জাঁদরেল সিপিআই নেতা।

অনুষ্ঠান মঞ্চে হঠাৎই দাবি উঠল দুই বঙ্গ এক করার। আবেগে আপ্লুত হয়ে কলকাতার সংস্কৃতি প্রেমিক মানুষ উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। সময়টা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষতম রাষ্ট্রপতি মিখাইল গর্বাচবের বদান্যতায় কমিউনিস্ট মহাশক্তির পতন ঘটেছে। সোভিয়েত ছারখার। এই ঘনঘটায় দুই জার্মানির মিলন হয়েছে। দুই কোরিয়া মিলে যাবে বলে জোর খবর। আর এই আবহেই কুচক্রীরা আবার ষড়যন্ত্রের জাল বিছাতে শুরু করল। কলকাতা-সহ সম্পূর্ণ বঙ্গ পাকিস্তানের দখলে নেওয়ার প্রবল ইচ্ছে ছিল জিন্না ও অন্যান্য পাক নেতাদের। হত্যা, লুণ্ঠন, দাঙ্গা কিনা হয়েছে। পাশাপাশি শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায়েদের দিয়ে সংযুক্ত বঙ্গের প্রস্তাব। যাতে পরে সুযোগ বুঝে তাকে পাকিস্তানের করায়ত্ত করা যায়। কিন্তু মুসলিম লিগের সমস্ত আশায় জল ঢেলে এই সমস্ত পরিকল্পনাতে বাদ সেধেছিলেন সেদিন এক বাঙ্গালি। তাঁর নাম ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। যাঁর নেতৃত্বে এবং কংগ্রেস-সহ সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের ইচ্ছেয় সেদিন বঙ্গভূমির পশ্চিমপ্রান্তে গড়ে ওঠে বাঙ্গালির নিজস্ব বাসস্থান— পশ্চিমবঙ্গ।

কিন্তু হাল ছাড়েনি কুচক্রীরা। তাই সোভিয়েত পতনের পর বিশ্ব রাজনীতির অসম্ভব টানাপোড়েনে দুই বঙ্গ এক করার আবেগে সুড়সুড়ি দিতে শুরু করল আরব সাম্রাজ্যবাদীরা। এই ষড়যন্ত্রের দোসর কমিউনিস্টরা হবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। সে সময় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বেশ কিছু মানুষ প্রশ্ন তুলেছিলেন দুই বঙ্গ এক হবে, এটা ভালো কথা। কিন্তু তা কি ভারতীয় মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে? এই প্রশ্নে আয়োজকেরা ছিলেন নীরব। ভুললে চলবে না, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। তিনি সব দেখছেন, শুনছেন এবং জল মাপছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক। বিশ্বব্যাপী পাটের বিশাল বাজারকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার অদম্য বাসনায় মুজিব বাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের খবরদারি মানতে পারছিলেন না। ভাষা ছিল একটা অছিলা মাত্র।

বৃহত্তর বাংলাদেশ বা বাংলাস্তান গড়ার পোস্টারে ছেয়ে গেছে ঢাকা ও বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা। পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের একাধিক জেলায় ব্যাপক অনুপ্রবেশকে কাজে লাগিয়ে এই বৃহত্তর বাংলাদেশে বাংলাস্তান গড়ার ছক কষছে জেহাদি জঙ্গিরা।

বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় তারা কথা বলতে পারে না, তাই তারা বাংলাতেই কথা বলে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য আরবীয় সংস্কৃতির প্রসার। এই নেতাদের মনের মধ্যে একটা ক্ষত তো রয়েই গেছে— তা হলো কলকাতাকে না পাওয়ার বেদনা! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে জিন্না যখন ঘোষণা করেন যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা, তাতে কিন্তু প্রতিবাদে গর্জে ওঠেনি পূর্বপাকিস্তানের মুসলমান নেতারা। তখন সেই ঘোষণার বিরুদ্ধে যিনি সোচ্চার হয়েছিলেন তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য, কুমিল্লা নিবাসী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। উর্দুর পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষাও স্বীকৃত হোক গণপরিষদে— ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন দিনাজপুরের গণপরিষদ সদস্য প্রেমহরি বর্মণ। এছাড়াও প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী লিয়াকত আলি, পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিবুদ্দিন, গণপরিষদের সহসভাপতি মৌলভি তামিজউদ্দিন প্রভৃতি। গণপরিষদের ৭৯ জন সদস্যের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ৪৪ জন

ফঃ ২

সদস্য সেদিন উপস্থিত থাকলেও মুসলমান ঐক্যের জোর এবং সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খুঁজে মুসলমান সদস্যরা প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেওয়ায় ধ্বনিভোটে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়।

তাহলে কী এমন ঘটনা ঘটে গেল যে পূর্বপাকিস্তানের আপামর মুসলমান নেতাদের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রতি অদম্য প্রেম জাগ্রত হয়ে উঠল? আসলে এ সবই ক্ষমতা দখলের লড়াই। বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালি জাতি নিজেদের গুণগত কারণেই বিশ্বব্যাপী নন্দিত, বন্দিত। এই সাফল্যের সিংহভাগ কৃতিত্ব হিন্দু সমাজের। বাঙ্গালি নবজাগরণের প্রাণপুরুষদের নামগুলো স্মরণ করলেই এর উত্তর পাওয়া যায়। বাঙ্গালির ভাষা ও সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল এই ইতিহাস হাজার হাজার বছরের উত্তারাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত।

ভাষা সংস্কৃতির অধিকার করায়ত্ত করে পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশে যে নামেই ডাকি না কেন, তারা প্রথমেই ঘোষণা করে 'হাজার বছরের বাঙ্গালির ইতিহাস'। চর্যাপদ থেকে যায় বিস্তার (যদিও চর্যাপদের সময়কাল তেরশো বছর আগে)। অর্থাৎ বখতিয়ার খিলজির মতো মুসলমান আক্রমণের পরেই বাঙ্গালি জাতীয়তার উত্থান। পাঠ্যপুস্তক থেকে ইতিহাস সব কিছুতেই লেখা হলো বাঙ্গালির ভাষা সংস্কৃতির বিকাশ সব কিছুই মুসলমান নবাবের হাত ধরে। প্রাচীন ভারতের রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদ— সব কিছুতেই বাঙ্গালির অস্তিত্বের স্বীকার থাকলেও ক্ষমতা দখলের অভিপ্রায়ে এব্যাপারে তারা চুপ থেকেছে। ১৯৫৫ সালে বাংলা ভাষা ও চর্চার জন্য ঢাকায় তৈরি হয় বাংলা অ্যাকাডেমি। মহম্মদ শহীদুল্লার চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত অ্যাকাডেমির প্রথম অধিকর্তা এনামুল হক। এদের প্রাথমিক কাজ হলো বাংলা ভাষা ও লিপির সংস্কার। সংস্কৃত ঘেঁষা এবং প্রাকৃত শব্দগুলির পরিবর্তন করে কত বেশি পরিমাণে আরবীয় শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করানো যায়, শুরু হয় সেই ষড়যন্ত্র।

বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বাংলা বর্ণমালাকে পরিবর্তন করে নিজেদের সুবিধামতো একটি বর্ণমালা তারা তৈরি করে নেয়। যেখানে যুক্তাক্ষর তুলে দেওয়ার প্রস্তাব নেওয়া হয়। ক্ত, ক্ষ, ক্ল ইত্যাদি বর্ণের লোপ ঘটানো হয়। মুণ্ডমালাতন্ত্র মতে বাংলা বর্ণমালার পঞ্চাশটি বর্ণই এক একটি মূর্তি। সাধকেরা এগুলিকে মাতৃজ্ঞানে আরাধনা করেন। অতএব এগুলির সংস্কার করে লণ্ডভণ্ড করাই হয়ে ওঠে পাক নেতাদের প্রাথমিক কাজ। সঙ্গে আশ্চর্যের বিষয়, ১৯৮৬ সালে দোর্দণ্ডপ্রতাপ বামফ্রন্ট 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি' গড়ে তুলে ঢাকা বাংলা অ্যাকাডেমির এনামুল হকের প্রস্তাবে সমর্থন দেয়। সরকারি স্বীকৃত সব পাঠ্যপুস্তকে সংস্কারিত বাংলা বানান বিধি চালু হয়ে যায়। যদিও কলেজ স্ট্রিটের কতিপয় ব্যবসায়ী রাজ্যসরকারের এই আবেদনে সাড়া না দিয়ে তারা পূর্বতন বিদ্যাসাগরীয় বানান বিধিতেই নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেন। কিন্তু সরকারি পুস্তকে শুধুমাত্র বানান সংস্কার করেই বাম নেতারা ক্ষান্ত হননি। তারা পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস চর্চায় বাঙ্গালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতির সব কিছুকে বাদ দিয়ে এক মিথ্যা ইতিহাস প্রজন্মের সামনে তুলে ধরে। অগ্নিযুগে অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর, আত্মোন্নতি সভা, বেঙ্গল ভলাটিয়ার্সের অসামান্য কৃতিত্ব কিছুই জানতে পারে না প্রজন্মের পর প্রজন্ম শিক্ষার্থীরা। আরবীয় কর্তাদের অঙ্গুলি হেলনে কলকাতা-সহ বৃহৎ বাংলাস্তানের এই পরিকল্পনা বোঝার জন্য মহাকাশ বিজ্ঞান গবেষণার প্রয়োজন নেই।

কোটা বিরোধী আন্দোলনের আড়ালে আরববাদ প্রতিষ্ঠাই বাংলাদেশের সাম্প্রতিক আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য তা ধীরে ধীরে ধরা পড়ছে। আফগানিস্তানের মতো বাংলাদেশেও একটি ইসলাম কলোনি তৈরির প্রচেষ্টা একধাপ পূর্ণ হয়েছে। বৃহত্তর বাংলাদেশ বা বাংলাস্তান গড়ার পোস্টারে ছেয়ে গেছে ঢাকা ও বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা। পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের একাধিক জেলায় ব্যাপক অনুপ্রবেশকে কাজে লাগিয়ে এই বৃহত্তর বাংলাদেশে বাংলাস্তান গড়ার ছক কষছে জেহাদি জঙ্গিরা। সামাজিক মাধ্যমে চলছে ঢালাও প্রচার। ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মারাণ্ডি সম্প্রতি এ নিয়ে সতর্ক করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারকে। গোয়েন্দাদের দাবি, বাংলাদেশ জামাতে ইসলামি ও হেফাজত ইসলামের মতো কর্মীরা এর প্রচার চালালেও এর পিছনে রয়েছে হুজি বা জেএমবি'র মতো বৃহৎ আরবীয় শক্তি। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের মদত রয়েছে এই ষড়যন্ত্রে তা পরিষ্কার বোজা যাচ্ছে। এবং যে জন আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে উচ্ছেদ করে এই ক্ষমতা দখল, তাও অনুমান করা যাচ্ছে।

বৃহত্তর এই বাংলাদেশ-বাংলাস্তানে রয়েছে বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গের সম্পূর্ণ অংশ ছাড়াও ঝাড়খণ্ডের বড়ো অংশ, বিহারের কিষাণগঞ্জ, কাটিহার, নেপালের ঝাপা, মায়ানমারের রাখাইন ও আরাকান অঞ্চল, আন্দামানের কিছু অংশ এবং উত্তরপূর্ব ভারতের অসম, মণিপুর, মেঘালয়, ত্রিপুরার কিছু অঞ্চল। পেশোয়ার করাচি, লাহোরের ভারত বিরোধী ব্লগারের পেজ থেকে প্রতিনিয়ত এর সমর্থনে প্রচার চলেছে। বাংলাদেশের অস্থিরতার সুয়োগ নিয়ে একাধিক কারাগার ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে শয়ে শয়ে বন্দি জঙ্গিরা। একটি সূত্রে জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশের শেরপুরের কারাগার ভেঙে পালিয়েছে পাঁচশোর মতো জঙ্গি। এরা অধিকাংশই হুজি, জে এম বির সদস্য।

ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়েই পড়েছে। এতদিন আড়ালে আবডালে ভারত বিরোধিতা, প্রতিনিয়ত বাঙ্গালি-বিহারি বিতর্ক তুলে, গোবলয় ও খোট্টা সংস্কৃতির কথা বলে, নানা অপপ্রচার চালিয়েও বাঙ্গালিকে আলাদা করতে পারেনি। বরং বাম সংস্কৃতিকে পিছনে ফেলে সনাতনী ভাবনায় জারিত এক নতুন বাঙ্গালির পুনর্জাগরণ ঘটেছে। বাংলাস্তানের এই ষড়যন্ত্র এরা ধরে ফেলেছে। শ্যামাপ্রসাদের মতো বৃহৎ মাপের নেতার আবির্ভাব না হলেও বাঙ্গালির সম্মিলিত শক্তি এই ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেই।

সাম্প্রতিক অভ্যুত্থান লক্ষ্য ইসলামিক বাংলাস্তান

বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বলা হচ্ছে ৭৫ বছরের মধ্যে একখানা জাতি তিন তিন বার— ১৯৪৭, ১৯৭১ এবং হালফিলের ২০২৪ সালে স্বাধীনতা অর্জন করল। কী, ভাবতে অবাক লাগছে না! কিন্তু অধুনা বাংলাদেশকে নিয়ে এটাই প্রচার, এটাই অপপ্রচার। সেখানকার ছাত্রবাহিনীর নেপথ্যে থেকে পাকপন্থীরা সে দেশের দীর্ঘ সময় ধরে হাসিনার নেতৃত্বে চলা আওয়ামি লিগের সরকারকে জঙ্গি আন্দোলনের দ্বারা উৎখাত করে ছেড়েছে। এটাই নাকি তাদের কাছে তৃতীয়বারের জন্য স্বাধীনতা অর্জন।

১৮ কোটি বাংলাদেশির মধ্যে খুব বেশি হলে কয়েক লক্ষ ছাত্র এবং তাদের উৎসাহদাতা কট্টরপন্থী ধর্মীয় গোষ্ঠী তথা জামাতে ইসলামি এবং অপর বৃহৎ রাজনৈতিক বিরোধী দল বিএনপি বিদেশের অঙ্গুলিহেলনে জঙ্গি আন্দোলন সংঘটিত করেছে। এই জঙ্গি আন্দোলনকে সফল করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও পুলিশের ভূমিকা কতখানি ছিল তা আজ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। সেনাবাহিনীর অসহযোগিতা এবং পরোক্ষ চাপের ফলে জাতির উদ্দেশ্যে বিদায়ী ভাষণ রেকর্ড করার আগেই শেখ হাসিনাকে দেশ ছাড়তে হয়।

বাংলাদেশে যে এরকম একটা অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে এটা বেশ কয়েক বছর যাবৎ সেখানকার সরকার বিরোধীদের কথাবার্তা থেকেই পরিষ্কার হচ্ছিল। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক মজহবি সংগঠনগুলো যেমন জামাতে ইসলামি এবং হেফাজতে ইসলাম দেশে শরিয়তি শাসন ব্যবস্থার পক্ষে নিরন্তর শিল্পী ও কৃতী মানুষদের স্ট্যাচু পর্যন্ত ভেঙে ফেলার জন্য আন্দোলন করেছে বা কখনো মুজিবুর রহমানের নতুন স্ট্যাচু বসানোর ক্ষেত্রে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। হেফাজতে ইসলামের ঘোষিত অবস্থান ও নীতি হচ্ছে দেশে কোনো রকমের মূর্তি থাকবে না। বিভিন্ন সময় দেখা গেছে সরকার তাদের আন্দোলনের কাছে, তাদের দাবির কাছে মাথা নত করেছে। এছাড়া বাংলাদেশে সব সময় একটা ভারত বিরোধী জিগির জাগিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে। ভারতের পণ্য বয়কট করার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান, টিভি টকশোগুলোতে ভারতের বিদেশ নীতির সমালোচনা এবং ভারত-বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক বড়ো চ্যালেঞ্জ জাতীয় কায়েমি স্বার্থবিরোধী বার্তা জনমানসে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। আবার কখনো কখনো দুই দেশের মধ্যে তিস্তার জল ভাগাভাগি নিয়ে চুক্তি করতে সক্ষম না হওয়াকে হাসিনা সরকারের এক বিশাল ব্যর্থতা হিসেবে দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পেছনে ভারতের প্রবল ও নির্ণায়ক ভূমিকা, করোনাকালে ভারত থেকে দেওয়া ভ্যাকসিন, এছাড়া রাস্তাঘাট নির্মাণ থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, সামরিক ক্ষেত্র, মহাকাশ গবেষণা প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের প্রতি ভারতের যে সহযোগিতা তাকে তারা অস্বীকার করেছে, অকৃতজ্ঞের মতো চেপে গেছে। এভাবে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ভারত বিরোধী মনোভাব তৈরি করতে তারা সফল হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজ দেশের উন্নয়নের স্বার্থে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেছিলেন। যার জন্য ভারত বিরোধিতার আন্ডার কারেন্ট হাসিনা বিরোধিতার জলোচ্ছ্বাসে পরিণত হয়। তবে একথা সাধারণ নিরপেক্ষ বাংলাদেশিকেও মানতে হবে যে, প্রধানমন্ত্রী হাসিনার ১৬ বছরের শাসনামলে বাংলাদেশ প্রতিটি ক্ষেত্রে যথেষ্ট এগিয়েছিল।

শুধুমাত্র ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক— হাসিনা সরকারের পতনের একমাত্র কারণ নয়। এর জন্য হাসিনার ভারতের মতো নিরপেক্ষ বিদেশ নীতি প্রণয়ন অন্যতম দায়ী। বিশ্বের দুই সুপার পাওয়ার রাশিয়া ও আমেরিকার সঙ্গে ভারসাম্য রেখে চলার ভারতীয় বিদেশ নীতিকে কপি করার নীতি বাংলাদেশের পক্ষে বুমেরাং হয়েছে। আমেরিকার প্রস্তাব মতো বঙ্গোপসাগর স্থিত সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বাংলাদেশ আমেরিকার হাতে তুলে দিতে হাসিনা রাজি হননি। ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর এলাকায় আমেরিকার খবরদারি বাংলাদেশ মেনে নেয়নি। অন্যদিকে পাকিস্তান সেই '৭১

থেকেই আইএসআই দ্বারা বাংলাদেশে সরকার বিরোধী এবং ভারত বিরোধী শক্তিকে মদত জুগিয়েছে। আজকে স্বেচ্ছা নির্বাসিত শেখ হাসিনাও প্রকাশ্যে বলছেন যে, তিনি যদি আমেরিকার কথামতো চলতেন তাহলে হয়তো তাকে এভাবে দেশ ত্যাগ করতে হতো না। পাকিস্তানের পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানেরও একই অভিযোগ— তাকে বরখাস্ত করার পেছনে আমেরিকার হাত ছিল। ভারতেও গত অষ্টাদশ লোকসভার প্রাক্কালে বর্তমান শাসক দলের বিরোধী রাজনৈতিক জোটকে আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যের কিছু দেশের নানান সংস্থা নানা ভাবে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছে, প্রচুর অর্থ জোগান দিয়েছে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে নানান অপপ্রচার চালাতে, আন্দোলন সংগঠিত করতে। পঞ্জাব, হরিয়ানা এলাকায় মুষ্টিমেয় ধনীক শ্রেণীর কৃষকদের আন্দোলনকে সারা ভারত ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। দিনের পর দিন কৃষকেরা দিল্লিমুখী অন্যতম প্রধান রাজপথ অবরোধ করে দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে বিদেশি শক্তির ইন্ধনে। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ফোরাম এবং সংবাদপত্র গোষ্ঠী ভারত সরকারের বিরুদ্ধে নিরন্তর অপপ্রচার চালিয়ে গেছে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতে এক দুর্বল, আত্মমর্যাদাহীন, অস্থিতিশীল সরকার গঠন করা।

এখন দেখার, রক্তের বিনিময়ে পাওয়া এই তথাকথিত স্বাধীনতা বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন নেতৃবর্গ ও ছাত্ররা রক্ষা করতে পারবে তো! কারণ তারা বাঘের পিঠে চড়ে ক্ষমতা আস্বাদন করছেন, পিঠ থেকে নামলেই বাঘ তাদের খেয়ে ফেলবে। প্রখ্যাত বাংলদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন তো বলেই দিয়েছেন— নোবেল প্রাপক অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ইউনুস সাহেবের যবনিকা পতন জামাতে ইসলামির হাতেই হবে। ঘোষণা মাফিক অবশ্য এদের উপর বেশিদিন সরকার চালানোর দায়িত্ব নাই। এরপর বাংলাদেশের মানুষের ভোটে নির্বাচিত যে সরকার আসবে তাকেও বুঝতে হবে শুধুমাত্র ভারত বিরোধিতার মন্ত্র দিয়ে দেশ চালানো যায় না। ভারতের সহযোগিতা ছাড়া বাংলাদেশের এক পাও চলার কোনো ক্ষমতা নেই। শুধুমাত্র সামরিক দিক দিয়ে নয়, অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে ভারতের পূর্ব সহযোগিতা এতদিন বাংলাদেশ পেয়েছে এবং আগামীদিনও এটা ছাড়া তারা অচল। তাই সরকারে যেই আসুক না কেন তাদের ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতেই হবে। আধুনিক বাজার অর্থনীতির বিশ্বে এটাই চরম বাস্তবতা। কিন্তু বাংলাদেশের মোল্লাবাদী জনগোষ্ঠীর প্রধান ইস্যু হলো ভারত বিরোধিতা। এক্ষেত্রে এরা পাকিস্তানেরই দোসর। ভারত বিরোধিতা দ্বারা তারা সেখানকার মানুষকে খেপিয়ে তুলেছে। হাসিনার বিরুদ্ধে আন্দোলনে স্লোগান উঠে— 'ভারত যাদের মামা বাড়ি, বাংলা ছাড়ো তাড়াতাড়ি'। দেশের সুপ্রিম কোর্ট কোটার বিরুদ্ধে রায় দিয়ে দেওয়ার পরেও কীভাবে কোটা বিরোধী আন্দোলন সরকার উৎখাতের আন্দোলনে পর্যবসিত হয়! খালি চোখে বিচার করলে দেখা যাবে বাংলাদেশের এই আন্দোলনের তিনটি ধাপ— প্রথম ধাপ ছিল কোটা বিরোধিতা, দ্বিতীয় ধাপ সরকার তুলে ফেলার আন্দোলন এবং তৃতীয় ধাপ আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে দেশ থেকে হিন্দুদের বিতাড়ন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জেলা উপজেলায় ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীকে নির্যাতন করা হচ্ছে। অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, হত্যা, অপহরণ, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, ভাঙচুর, মন্দির ধ্বংস ইত্যাদির মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের মধ্যে চরম ভয়ভীতি সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে তারা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে পালিয়ে যায়। এই উন্মত্ত, জেহাদি বাংলাদেশিদের এসব কাজ দেশের সদ্য ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী লুকোনোর চেষ্টা করছে। বিদেশিদের ঠকানোর জন্য গণমাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে যে তারা হিন্দু সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্থান রক্ষা করতে রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে। হিন্দুদের মন্দিরগুলোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে আর কৌশলী প্রচার হচ্ছে যে সেখানে নাকি আওয়ামি লিগের নেতা মন্ত্রী এবং সমর্থকদের উপর অত্যাচার চলছে। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন থাকে, তাহলে তো আওয়ামি লিগের সমর্থক হিন্দুদের উপর আক্রমণ হবে। মন্দির প্যাগোডায় আক্রমণ হবে কেন?

১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অবিভক্ত পাকিস্তানে এবং ১৯৭১-এর মুক্তি যুদ্ধের পূর্বাপর বাংলাদেশে ঠিক একই কায়দায় আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে হিন্দুদের দেশ থেকে তাড়ানো হয়েছিল বা জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। পাকিস্তানে অবশিষ্ট এক শতাংশ হিন্দুদের উপর এখনো এরূপ অত্যাচার জুলুম চালু রয়েছে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ভাষা, লোকাচার, রাজনীতি, ধর্মীয় উদারতা, গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল সমস্ত কিছুকে বদলে ফেলে ইসলামিকরণ করার একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে যেটাকে আমরা আরেকটা পাকিস্তান সৃষ্টির প্রস্তুতি পর্ব বলাতেই পারে। সেখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মুজিবুর রহমান, রবীন্দ্রনাথের স্ট্যাচু ভেঙে ফেলা হয়েছে। সেখানকার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পালটে ফেলা হচ্ছে। চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে কীভাবে একটা দেশ চরম মোল্লাবাদী পথে চলে যাচ্ছে। সেখানকার মোল্লাবাদীরা এমন হুংকার ছাড়ছে যে, তারা ইতিমধ্যে বাংলাদেশকে করায়ত্ত করেই ফেলেছে। এরপর তাদের লক্ষ্য ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, বিহারের কিছু অংশ নিয়ে, অসম ও উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোর অনেকটা করে অংশ নিয়ে বৃহৎ 'ইসলামিক বাংলাস্তান' গঠন করা।

এই লক্ষ্যে তাদের কর্মকাণ্ড অবশ্যই বিগত বেশ কিছু বছর ধরেই চলছে। নিরন্তর অনুপ্রবেশ বাংলাদেশ বর্ডার দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঘটেই চলেছে। শুধুমাত্র রোহিঙ্গারা নয়, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশি মুসলমানরা ভারতে প্রবেশ করছে বহুদিন যাবৎ এবং তারপর তারা পরিকল্পনা মাফিক সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে।

এ নিয়ে ভারতের ভোটভিখারি রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো হেলদোল নেই। কারণ বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীরা প্রত্যেকে তাদের কাছে সলিড ভোটব্যাংক। এজন্য তারা অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিদের, রোহিঙ্গাদের আধার ও ভোটার কার্ড বানিয়ে দেয়, রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করে দেয়, ভারতে বসবাসের জন্য বাড়ি তৈরি করে দেয়। অপরিণামদর্শী হিন্দু বাঙ্গালি আর কবে বুঝবে, যে দেশটা ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়েছিল সেই দেশটা এখন জেহদিরের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

হিন্দু বাঙ্গালিরা কতদিন এইভাবে তার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ধর্মাচরণ বজায় রেখে চলতে পারবে? কারণ অভিজ্ঞতা বলে, দেশের যে সমস্ত স্থানে সহিষ্ণু হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ একমাত্র সেই সমস্ত স্থানে গণতন্ত্র, উদারতা, সর্বধর্ম সমভাব ইত্যাদি উচ্চতর মানবিক আদর্শ বলবৎ রয়েছে। অপরপক্ষে যেখানে হিন্দু

সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, সেখানে এসবের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। আজকে জম্মু-কাশ্মীর, অসমের একটা অংশ। পশ্চিমবঙ্গ, মালদা, মুর্শিদাবাদ, কেরালার মালাপ্পুরম এলাকার হিন্দুরা নিজ ভূমে পরবাসী। তাসত্ত্বেও রাজনীতির এমনই খেলা যে বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো মুসলমান তোষণের কারণে এইসব দেখেও দেখে না। এই যে এখন বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর এরকম নির্যাতন তা নিয়ে ভারতের কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো বক্তব্য নেই। অথচ সুদূর পশ্চিম এশিয়ার হামাসের পক্ষ নিয়ে তাদের অশ্রু-বিসর্জনের শেষ নাই। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের তথাকথিত সেকুলার ও কমিউনিস্টরা এই সাম্প্রদায়িক তোষণ তথা হিন্দু বিরোধিতার চূড়ান্ত নিদর্শন রেখে চলেছে।

শুধুমাত্র মোল্লা মৌলবিরা বাংলাদেশের এই অত্যাচারের পক্ষে বা অত্যাচারকে লুকানোর পক্ষে কথা বলছে এমন নয়, এ দেশের কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও তৃণমূলের সাঙ্গোপাঙ্গরা একই লাইনে হেঁটে চলেছে। ভারতের প্রাচীনতম রাজনৈতিক দলটির একজন প্রবীণ নেতা এতে এত বেশি উৎফুল্ল হয়েছেন যে, বাংলাদেশের মতো কনককটেড বিপ্লব ভারতেও ঘটতে চলেছে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এখানকার শিক্ষক বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশের আবু সাঈদ যে জঙ্গিপনা করতে গিয়ে নিরাপত্তা রক্ষীদের গুলি খেয়ে মৃত্যু হয়েছে, তাকে বাহান্নর সালাম জব্বারদের সমগোত্রীয় হিসেবে তুলে ধরছেন। তারা কখনোই মুদ্রার ওপিঠের কথা বলেন না। সেখানে যে ছাত্ররা ক্রীড়নক মাত্র, আসল কর্মকর্তারা পর্দার আড়াল থেকে সরকার বিরোধী আন্দোলন সংঘটিত করেছে এ কথা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। কারণ সেখানকার তথাকথিত বিপ্লবী জনগণ যে আচরণ করেছে তা কখনো কোনো ছাত্রদলের আচরণ হতে পারে না। সেখানে দেখা যাচ্ছে উচ্ছৃঙ্খল যুবসমাজ মাতৃসমা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অন্তর্বাস নিয়ে লাফালাফি করছে। বিপ্লবের নামে তাদের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে অশ্লীল কটূক্তি করছে। এটা কী ধরনের বিপ্লব? এটা কী ধরনের স্বাধীনতা? যেখানে দেশের ইতিহাসকে মুছে ফেলা হবে, যে ব্যক্তি স্বাধীনতা দিয়েছে তাকে অস্বীকার করা হবে, যে শিল্পী জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশের গর্ব তার স্ট্যাচুকে অসম্মান করা হবে, বাংলা বর্ণমালার জনক বিদ্যাসাগরের মূর্তি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি ভেঙে ফেলা হবে, সেখানে নৈরাজ্য ছাড়া আর কী থাকতে পারে!

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, দেশে দেশে অনেক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, কখনো রক্তপাতের মাধ্যমে আবার কখনো রক্তপাতহীন। কিন্তু বিপ্লবী জনতা কখনোই তাদের ইতিহাসকে অস্বীকার করেনি। কোনো জাতি তার অতীত ঐতিহ্য এবং ইতিহাসকে মুছে ফেলতে পারে না। কিন্তু মুসলমানরা এতই অসহিষ্ণু ও ম্যানিপুলেটিভ যে তারা দেশের পূর্ব ইতিহাস, প্রাচীন নিদর্শন, সভ্যতা, সংস্কৃতি এমনকী ভাষা, সবকিছুকে ধ্বংস করে ছাড়ে। পাকিস্তানের স্কুল কলেজে পাঠ্য ইতিহাসে অবিভক্ত ভারতের ৩০০০ বছরের প্রাচীন সমৃদ্ধ ইতিহাসের ভগ্নাংশও স্থান পায়নি! ভারতে সুলতানি আমল, মুঘল আমল যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে পড়ালেও পাকিস্তানে মৌর্যবংশ, গুপ্ত বংশ পড়ানো হয় না। জেহাদি তুর্কি সেনাপতি বক্তিয়ার খিলজি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির কয়েক লক্ষ পুস্তক পুড়িয়ে ফেলেছিল। একইরকম ভাবে বাংলাদেশের সফল বিপ্লবী জনতা সেদেশের এক সমৃদ্ধ লাইব্রেরি পর্যন্ত ভেঙে ফেলেছে শুধু নয়, সেখানেকার বহু মূল্যবান দুর্লভ গ্রন্থ আগুনে নষ্ট করেছে। এই জিনিস এক দশক আগে সুদূর ইরাকেও দেখা গিয়েছে। আইসিস ইসলামিক স্টেট জঙ্গিরা ইরাকের নিমরূদে থাকা মেসোপটেমীয় সভ্যতার সংরক্ষিত কীর্তি ও প্রাচীন গ্রন্থ আগুনে পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছে।

আফগানিস্তানের বামিয়ানে কীভাবে কট্টরপন্থী তালিবান জিহাদিরা বুদ্ধমূর্তিকে কামানের গোলা দিয়ে ধ্বংস করে ফেলেছে। কিছুদিনের মধ্যে হয়তো বাংলাদেশেও সেই রকমই এক অভ্যুত্থান দেখা যাবে, তারা তাদের ইতিহাস আমূল পালটে দিয়ে শুধুমাত্র জেহাদের পথে ধাবিত হবে।

বাংলাদেশ ভারতের এক প্রতিবেশী দেশ। সেখানকার বিষয় নিয়ে আমাদের এত উদ্বেলিত হওয়ার কী আছে? নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ তার বিদেশ নীতি অনুযায়ী কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলায় না বা আগামী দিনেও গলাবে না। কিন্তু বাংলাদেশের ইসলামীকরণ ভারতবর্ষের অস্তিত্বের পক্ষে এক বিশাল থ্রেট। শুধুমাত্র এই জন্যই ভারত সরকার শুধু নয়, সমস্ত ভারতবাসীকে খোলা চোখে নিরপেক্ষতার সঙ্গে সমস্ত বিষয়গুলোকে বিচার বিবেচনা করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক মহলকে সচেতন করতে হবে যাতে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতন কমানো যায় এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশের ইসলামীকরণকে রোখা যায়। এজন্য ভারতবর্ষের যেমন দায়িত্ব আছে রাষ্ট্রসঙ্ঘে এই বিষয়গুলি তুলে ধরা, তেমনই বাঙ্গালি তথা সমস্ত ভারতবাসীর উচিত এ বিষয়ে জনমত তৈরি করা। সেই কবে প্রখ্যাত বাঙ্গালি নীরদ চন্দ্র চৌধুরি বাঙ্গালিকে আত্মঘাতী জাতি বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাঙ্গালি কূপমণ্ডুকতা, অসংবেদনশীলতা, স্বার্থপরতা করে ভারতবর্ষে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। আজকে তারাও তাদের ইতিহাস ভুলে গেছেন। অত্যাচারিত বাংলাদেশিদের জন্য তাদের কোনো অনুভূতি নেই, নেই কোনো মায়া-মমতা। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, দুই ২৪ পরগনার এক বিশাল এলাকায় মতুয়াদের বাস। তাদের প্রায় সবাই বাংলাদেশ থেকে অত্যাচারিত হয়ে এদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। দীর্ঘদিন ভারতে বসবাস করছেন নিরাপদে। কিন্তু তাদেরই আরেকটা অংশ যারা বাংলাদেশে রয়ে গেছেন তাদের জন্য এদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। এরা শুধু ব্রাহ্মণদেরই গালি দিয়ে চলেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বাম নেতার একটা বড়ো অংশ পূর্ববঙ্গ থেকে ছিন্নমূল হয়ে আসা মানুষ। কিন্তু তারা আমৃত্যু ধর্মনিরপেক্ষতা ও প্রগতিশীলতার নামে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, সনাতন মত ও পথকে বিদ্রূপ ও আক্রমণ করে গেছে! আজও অবশিষ্ট যে গুটিকয়েক কমিউনিস্ট রয়েছেন তারাও বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। বাংলাদেশে মোল্লাবাদীদের উত্থানে এরা উচ্ছ্বসিত। বিপ্লবের নামে রাহাজানি, ধ্বংস, লুটপাট, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, অসভ্যতা ও নোংরামির সমর্থনে এরা রাজপথে মিছিল করেছে, ঠিক যেমনটা এদের পূর্বসুরিরা ৭৮ বছর আগে মুসলিম লিগের পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থন করেছিল। তাই সচেতন হতে হবে। না হলে পৃথিবীর বুক থেকে হিন্দু বাঙ্গালির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। □

বাঁচার জন্য হিন্দুকে জাগ্রত থাকতে হবে

অবৈধ সম্পদের অশুভের ডাক ফেলতে পারছেন না কারা? কতটা গভীরে তার নোঙর? কী সেই মোহ, যা অনবরত দেবতার ডাককে উপেক্ষা করতে শেখায়?

কল্যাণ গৌতম

কে জেগে আছো? বাঙ্গলা জাগো, জাগো বাঙ্গলা বলছো বটে! কালরাত্রে জাগে নাকি ভুজঙ্গ বিষধর! সাপের শীতঘুম ভাঙানোর জন্যই কি জাগরণ বার্তা? নিদ্রিত হিন্দুর যেমন ঘুমিয়ে থাকার কথা, তেমনই ঘুমে কাটবে? নিকষকালো রাতে সর্প-যাপন হবে! আর অচেতনে কালাচের ছোবল খাবে!

এমনিতেই অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব! এমনিতেই তাঁর শান্তি শয়ান! রাবীন্দ্রিক ভাষায় বলতে গেলে-'' ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো/পোষ-মানা এ প্রাণ, বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান।'' তাদের 'অলস দেহ ক্লিষ্টগতি। তাদের ঘুমের পরও নিদ্রারসে জারণ— ''তৈল ঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রারসে-ভরা, মাথায় ছোটো বহরে বড়ো বাঙালি সন্তান।''

অতএব ধনলাভের উপায় দেখিয়ে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা করার পরামর্শ দিলেন সমাজের পুরোহিতরা। ব্রতকথায় শোনালেন কোজাগরী--- কে জেগে আছো?

নিদ্রা-জাড্যতা বোধ হয় বাঙ্গালি হিন্দুর দীর্ঘদিনের অভ্যাস। ঘুম ভেঙে ওঠার পর আবার এক ঘুম। ঘুম যেন আরামের, ভাঙতেই চায় না! সাধক রামপ্রসাদকে তাই বলতে হলো ''জাগা ঘরে চুরি নেই।'' প্রচল-কথাও হলো 'জাগরণে ভয়ং নাস্তি।' বাঙ্গালির চেতনা ঘুমিয়ে থাকে বলেই বাঙ্গালির কোজাগরী আরাধনায় নিশি জাগরণের আহ্বান, ''জাগরণে লক্ষ্মীর কৃপা, নিদ্রায় লক্ষ্মী হন বিরূপা।''

তবুও ১৯৪৬ সালে লক্ষ্মীপূজার দিন নোয়াখালির বাঙ্গালি তা ভুলে গেল! বাঙ্গালি হিন্দুর ভুলো মন! কোজাগরী জাগরণের প্রস্তুতি আর সতর্কতা ছিল না, থাকে না। রাত জাগা তো আর খালি হাতে হয় না! ধন-সম্পদ পাহারা দেবার জন্যও সশস্ত্র হতে হয়। ব্যাংকের গার্ডের হাতেও তো অস্ত্র থাকে! ধনের দেবী লক্ষ্মী। লক্ষ্মী আরাধনার তাৎপর্য বাঙ্গালি ভুলে গেছিল! লক্ষ্মী সৌন্দর্যের দেবীও বটে,'শ্রী'। গৃহশ্রী লক্ষ্মী পদবাচ্য। জায়া-জননী-কন্যার মানরক্ষা ও প্রাণরক্ষাও লক্ষ্মী-আরাধনা। এদিকে মহাবিস্মরণ বাঙ্গালির একটি কঠিন রোগ। বাঙ্গালি তার সাম্প্রতিক সব ইতিহাস ভুলে গেছে। ভুলে যায়— এটাই সব চাইতে বড়ো রোগ।

সেই সময় ভারতবর্ষের মুসলমানরা সঙ্ঘবদ্ধই ছিল, সুগঠিত ছিল ভারতীয় খ্রিস্টানরাও, কেবল হিন্দুরা তখন ছিল অসার-অবশ হয়ে ঘুমিয়ে। যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ বলেছেন, '' মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ অত্যাচারিত হলে সমগ্র সম্প্রদায় তার প্রতিকারে সচেষ্ট হয়। আর হিন্দুর মধ্যে সংহতি শক্তি নাই বলেই তো দুর্বৃত্তরা অত্যাচার, উৎপীড়ন, নারীহরণ, নারীধর্ষণ করে রক্ষা পায়।'' এমন জাতিকে জাগিয়ে, তারই শাখা-প্রশাখাগুলিকে সমন্বিত করে হিন্দু জাগরণ ঘটালেন একজন 'জাদুকর', হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তনীয়া, তিনি যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ। বললেন, ভারতবর্ষকে যদি শক্তিশালী করতে হয়, তবে শক্তিশালী হিন্দু জাতির উত্থান ছাড়া সম্ভব নয়। বললেন, নানা জাতির মিলন সর্বদা সমানে সমানে হওয়া উচিত, সবলে-দুর্বলে নয়। হিন্দুকে তাই সবল হতে হবে। হিন্দুর মধ্যে যখন সঙ্ঘশক্তি গড়ে উঠবে, এক হিন্দুর বিপদে সহস্র হিন্দু জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াবে তখন সাম্প্রদায়িক দুর্বত্তরা আপনা আপনিই সংযত, ত্রস্ত হয়ে যাবে। বললেন,''আমি সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করতে চাইনে, সাম্পদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী দুষ্টের দমন চাই।'' 'ধর্মই বর্ম' হাতে কাম(কাজ) মুখে নাম', মহামৃত্যু হলো আত্মবিস্মৃতি। তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রিয় পাত্র যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ।

কর্মযোগী শিবপুরুষ স্বামী প্রণবানন্দ হিন্দুদের দিয়ে গেলেন অকুতোভয় আত্মবিশ্বাসের সুর। হিন্দুধর্মের আহ্বান 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' তো আছেই, 'অয়তু সর্বতো স্বাহা' তো ছিলই, এবার তিনি বলতে এলেন, 'হিন্দু বিদ্যায় বড়ো, বুদ্ধিতে বড়ো, অর্থসামর্থ্যেও সে কাহারও অপেক্ষায় কম নয়। কিন্তু নাই কেবল সংহতি শক্তি। ওই সংহতি শক্তির অভাবে হিন্দু আজ সর্বত্র লাঞ্ছিত, নির্যাতিত। সর্বপ্রকার ভেদ-বৈষম্য, অনৈক্য-পার্থক্য, ঈর্ষা-দ্বেষ বিদূরিত করিয়া এই শতছিন্ন হিন্দু সমাজকে যদি আবার ঐক্য, সখ্য, প্রেম,

প্রীতি ও মিলনের সূত্রে সম্মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলেই হিন্দু আবার তাহার সুপ্ত শক্তি পুনরুদ্ধার করিয়া জগতে অজেয় হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে।”

তিনি বললেন,‘‘আমি হিন্দুকে হিন্দু বলে ডাক দিতে চাই। আমি সমগ্র হিন্দু জনসাধারণকে ‘আমি হিন্দু’, ‘আমি হিন্দু’, জপ করাব।”

হিন্দুরক্ষী দল গঠন করে আত্মরক্ষা, ক্ষাত্রশক্তি ও সংহতিবলের সঞ্চারের জন্যই তাঁর ধরাধামে আগমন। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান করতেই তিনি এসেছিলেন। সহস্র স্ব-জাতি, সহস্র স্ব-ধর্মপ্রেমী কর্মী, শত শত ত্যাগী সন্ন্যাসীকে হিন্দু-ভাবনায় ঐক্যবদ্ধ করে তুলতেই তাঁর আবির্ভাব। তিনি মিলনের ঈশ্বর, সে মিলন হিন্দুত্বের, সে সমন্বয় সনাতনের, সে বাঁধন অখণ্ড ভারতবর্ষের।

রাজনীতিতে তিনি এমন একজন শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত ও পরিশ্রমী মানুষ খুঁজছিলেন যিনি হিন্দুদের স্বার্থ দেখতে পারবেন। তাঁর স্থূল জীবন তখন ফুরিয়ে আসছে, নানান রোগ-ব্যাধি বাসা বেঁধেছে শরীরে। শরীর যাওয়ার আগে হিন্দুদের নয়নের মণি তিনি বেছে দিতে চান, তার মধ্যে যাবতীয় যোগশক্তি তুলে দিতে চান। আর তর সইছে না! সত্যিকারের বাঙ্গালি হিন্দু রাজনীতিবিদ দরকার যিনি তাদের হয়ে মুখ খুলতে পারেন, কোনো মুখোশ পড়ার দরকার হয় না।

শতধা বিচ্ছিন্ন হিন্দু সমাজকে কেটে কেটে টুকরো করতে চেয়েছিল তখনকার ‘টুকরে-গ্যাং’, তাঁদের সঙ্গে আপাত ফারাক ছিল না রাজনীতির সুবিধাবাদী মানুষের, এ কাজে ফারাক করা গেল না চতুর বুদ্ধিজীবীদের; তারা হিন্দুদের বিভেদ বাড়িয়ে দিয়ে শাস্ত্রের দিকে আঙুল তুললো। হিন্দুদেরকে যথাসম্ভব শাস্ত্র-বিরোধী করতে সচেষ্ট হলো। এমতাবস্তায় অনাদি-অনন্ত হিন্দু জীবনচর্যায় সাময়িক বিক্ষিপ্ততায়, নতশির জাতির সামনে উপস্থিত হলেন

তাপস-শ্রেষ্ঠ প্রণবানন্দজী।

বাঙ্গালি হিন্দুর নিত্য ‘চৈতন্য হোক’। চৈতন্য লাভ করতে হলে যেহেতু জাগরণ দরকার, তাই এ রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে চেতনার বাণীই হবে— সবচাইতে বড়ো বিপ্লব। সে যে দলেরই হোক না কেন। হিন্দু-কর্মীর বুকে অন্য দলের হিন্দু-কর্মীর ছুরিকাঘাত চলবে না, এই চৈতন্যটুকু দলীয় কর্মীর সবচাইতে বড়ো ও মহৎ পরিচয় হতে পারে। বঙ্গ তবেই মুক্তি পাবে। সম্প্রতি উপলব্ধ হয়েছে, কতিপয় বাঙ্গালি-হিন্দু অশুভ-অমার্জিত বন্ধন কেটে বের হতে পারছে না। তাঁদের অপরিসীম অশুভ-আঁতাত। নিজের র‍্যাডারেই নিত্যদিন লাঞ্ছিত। যে রাজনৈতিক দলটি তাদের আয়ত্তের মধ্যে, যে দলটি জারনে ডন হবার প্রতিজ্ঞা, সেই দল কি কখনো বলবে, ‘তোমার চৈতন্য হোক? বলবে, বিবেক যখন পীড়া দেয়। তার চাইতে আর বড়ো শাস্তি আর হয় না! চারপাশে অসংখ্য অসাধুতার বিপ্রতীপে যদি নিরপেক্ষ থাকা যায় তবুও মনুষ্যত্ব আছে বলা চলে। যদি অসাধুতার বিপ্রতীপে সোচ্চার ও সবল হওয়া যায়, তখন আসে দেবত্ব।

আনন্দমঠ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন,‘‘ ‘‘আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জ সমীরণ শীতলা শস্য শ্যামলা মা।” মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে আপনার নৈতিকতার চাইতেও হয়তো বড়ো বিষয় নিজেকে ক্ষমা করতে না পারা। বাঙ্গালি কি একদিন নিজেকে বলবেন না ‘‘ক্ষমিতে পারিলাম না/ক্ষম হে মম দীনতা।”

অবৈধ সম্পদের অশুভের ডাক ফেলতে পারছেন না কারা? কতটা গভীরে তার নোঙর? কী সেই মোহ, যা অনবরত দেবতার ডাককে উপেক্ষা করতে শেখায়?

এই দুর্নীতি একদিন বাঙ্গলি হিন্দুকে ভেতর থেকে বাঁচতে দেবে না। নিজের অন্তরে, নিজের বিবেকের কাছে নিজের মনের মৃত্যুদণ্ডের ব্যথা বইতে হবে। পৃথিবীর কোনো বেদনার চাইতে তা আজ পর্যন্ত মর্মান্তিক বলে প্রমাণিত হয়নি। মনে রাখতে হবে, সুখী বাঙ্গালি, ‘‘জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী” হলার সুযোগ আপনার আর কখনও নাও আসতে পারে। তাই বাংলাদেশে বা যেখানে যেখানে হিন্দু বাঙ্গালি জেগে উঠেছে, তাদের জন্য বার্তা সন্দেশ চাই। □

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যা কতদিন পর্যন্ত সংখ্যালঘু থাকবে?

বিপ্লব বিকাশ

সংখ্যালঘু বলতে কাকে বোঝায়? এই প্রশ্ন উঠলেই আপনার মনের মধ্যে কোনো সম্প্রদায় বা 'রিলিজিয়নের' মানুষটির কথা প্রথমে আসে? যখন কোনো নেতা সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে কথা বলেন, তখন সবচেয়ে বেশি লাভবান কে হয়? দেশের অধিকাংশ মানুষের মনোভাব হলো; সংখ্যালঘু মানে মুসলমানরা। কিন্তু কেন? শিখ, জৈন, পারসি বা বৌদ্ধ সম্প্রদায় কেন উপেক্ষিত? এর কারণ হলো, গত তিন দশকে সংখ্যালঘু শব্দটি কেবল মুসলমানদের সঙ্গে যুক্ত করে দেশের মানুষের মন-মস্তিষ্কে প্রবেশ করানো হয়েছে।

ভারতের সংবিধান ধারা ২৯ ও ৩০-এর মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত অধিকার রক্ষা করে। যদিও 'সংখ্যালঘু'র কোনও সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। তবে সংবিধান ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বীকৃতি দেয়। ১৯৪৮ সালে সংবিধান সভার চর্চায় এই বিষয়গুলো গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ১৯৯২ সালের জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন আইনের অধীনে মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ ও পারসি সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু মর্যাদা দেওয়া হয়। জানুয়ারি ২০১৪ সালে, রাজনৈতিক চাপের কারণে, জৈনদের সংখ্যালঘু মর্যাদা দেওয়া হয়। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, জৈন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ঘোষণা করে, যদিও তাদের জনসংখ্যা তখন প্রায় ১৩ কোটি ছিল, যা ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১২.৫ শতাংশ। সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ভারতের সংখ্যালঘু মর্যাদা নির্ধারণে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ২০০২ সালের ঐতিহাসিক টিএমএ পাই ফাউন্ডেশন বনাম কর্ণাটক রাজ্য মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এই রায় দিয়েছিল যে কোনও সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘু মর্যাদা কেবল রাজ্য সরকারই তার রাজ্যের মধ্যে নির্ধারণ করতে পারে। এর মানে হলো, ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জাতীয় স্তরে নয়, বরং রাজ্যভিত্তিক স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

যে ভূমিকে মুসলিম লিগ ও ব্রিটিশরা ভারত বিভাজনের পরীক্ষাগার হিসেবে বেছে নিয়েছিল, সেই পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের ধর্মীয় জনসংখ্যার অবস্থান সম্পর্কে ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে কিছু আলোচনা করা যাক। গণিত অত্যন্ত নির্মম এবং এর ইঙ্গিত যে সমাজ বোঝে না সে তার ইতিহাসের গৌরব এবং ভূমির বিশালতা উভয়ই হারিয়ে ফেলে। এটা সর্ববিদিত যে ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালে মধ্যরাত্রিতে ভারতের বিভাজন হয়েছিল। আশ্চর্যজনক বিষয় যে ভারত এবং পাকিস্তানের সীমানা ১৯৪৭ সালে একজন ব্রিটিশ আইনজীবী (!) সাইরিল র‍্যাডক্লিফ দ্বারা আঁকা এবং চূড়ান্ত করা হয়েছিল। তাকে সীমান্ত কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, যার কাজ ছিল ব্রিটিশ ভারত-পাকিস্তানের নতুন সীমা নির্ধারণ করা। র‍্যাডক্লিফকে এই কঠিন কাজ সম্পন্ন করার জন্য মাত্র পাঁচ সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছিল! তিনি আগে কখনও ভারতে আসেননি এবং ভারতীয় জনসংখ্যা এবং স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে একদমই পরিচিত ছিলেন না। আশ্চর্যের বিষয়, একজন ব্রিটিশ আইনজীবী যিনি কখনও

ভারতে আসেননি তাকে মাত্র পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন রাষ্ট্রের সীমানা প্রধানত ধর্মীয় জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেসের বয়স্ক ও ক্লান্ত নেতারা দেশবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার খেলা খেলেছিল। এত তাড়াহুড়ো কেন ছিল গান্ধী-নেহরুর?

যখন এই আইনজীবী মানচিত্রে রেখা আঁকছিলেন তখন তার মনোযোগ মূলত ধর্মীয় জনসংখ্যায় ছিল এবং রেখাগুলি কোথায় আঁকা হয়েছিল? বঙ্গ ও পঞ্জাব প্রদেশের মানচিত্রে! কারণ ১৯৪১ সালের জনগণনা অনুযায়ী বঙ্গে ৫৩.৪ শতাংশ এবং পঞ্জাবে ৫৩.২ শতাংশ মুসলমান জনসংখ্যা ছিল! অর্থাৎ এই দু'টি প্রদেশে তখন মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। তাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এবং ভারত তার বিশাল ভৌগোলিক সীমানা এবং সম্পদ হারায়। জনসংখ্যার পরিসংখ্যান সম্পর্কে সচেতন না হলে ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও সম্পদ, পরিবার, সমাজ ও জাতিকে রক্ষা করা যাবে না একথা প্রমাণিত। সিন্ধ ও ঢাকা অঞ্চলের বড়ো-বড়ো ব্যবসায়ীদেরকে তাদের জীবন বাঁচাতে যেভাবেই হোক ভারতে পালিয়ে আসতে হয়েছিল এবং এখানে শরণার্থী শিবিরে থাকতে হয়েছিল। আজ পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বিন্যাস আবার একবার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন? ভারত-বিরোধী শক্তি ভারতকে বিভাজিত করার জন্য তার বৈশ্বিক কাঠামো এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানে সংখ্যালঘুর সংজ্ঞা স্পষ্ট নয়, মানুষ এই বিষয়ে আলোচনা, চিন্তা ও দাবি থেকে দূরে, সম্ভবত শেষের সে দিনের অপেক্ষায় রয়েছে এবং ভোটভিখারি রাজনৈতিক দলগুলিও ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করেই ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চায়।

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের ২৩টি জেলার মধ্যে ৩টি জেলায়, মুর্শিদাবাদে ৬৬.২৮ শতাংশ, মালদায় ৫১.২৭ শতাংশ এবং উত্তর দিনাজপুরে ৪৯.৯২ শতাংশ, মুসলমান স্পষ্টভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া ও বীরভূমে ২৫ শতাংশের বেশি মুসলমান জনসংখ্যা রয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ২৭.০১ শতাংশ। ২০২৩ সালে এই সংখ্যা প্রায় ২৯ শতাংশ হওয়ার পূর্বাভাস ছিল। ভাবার বিষয় হলো, এই সংখ্যাগুলি বৈধ মুসলমান জনসংখ্যার। কিন্তু এটা সর্ববিদিত যে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশ থেকে এসে বসবাস করছে যা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা এবং সামাজিক সৌহার্দ্যের জন্য প্রতিনিয়ত সমস্যা হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে। গত মে মাসে কলকাতায় বাংলাদেশের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিমকে একটি গ্যাং দ্বারা হত্যা করা হয় এবং সিআইডি শিয়াম হুসেনকে দেহ লুকানোর অপরাধে গ্রেপ্তার করে। মালদা, মুর্শিদাবাদ, দেগঙ্গা, বসিরহাটের মতো এলাকায় সংঘটিত সহিংস কার্যকলাপ সংবাদপত্রের শিরোনামে থাকে। লোকসভা নির্বাচনের সময় সন্দেশখালিতে জাতীয় তদন্ত সংস্থাকে আসতে

এটা সর্ববিদিত যে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশ থেকে এসে বসবাস করছে যা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা এবং সামাজিক সৌহার্দ্যের জন্য প্রতিনিয়ত সমস্যা হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে।

হয়েছিল। ২০১৪ সালের খাগড়াগড় বোমা বিস্ফোরণে ১৯ জন আসামিকে এনআইএ-র বিশেষ আদালত সাজা দিয়েছে, যার মধ্যে ৪ জন বাংলাদেশি। রানাঘাটের ৭১ বছর বয়সি নানের ধর্ষণের জন্যও একজন বাংলাদেশি নাগরিককে আজীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছে আদালত। প্রধান সড়ক, প্রধান সেতু, রেলস্টেশন, সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল এবং সুন্দরবনের দ্বীপপুঞ্জে আশেপাশের ঘন মুসলমান জনবসতি দেখা যেতে পারে। এইসব এলাকায় সাধারণত হিন্দুরা যেতে চায় না। কলকাতায় 'মিনি পাকিস্তান' গড়ে ওঠার খবর পাকিস্তানের ডন পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলির পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর। মানুষের জীবন ও সামাজিক আচরণে অত্যধিক প্রভাব তাদের গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সমাজের দ্বারা পড়ে। যে সমাজ তার রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির কারণে মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে স্থানীয় সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তা ধীরে ধীরে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। একটি উদাহরণ। গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭-তে ইন্ডিয়া টুডেতে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'সরস্বতী পূজার সময়, পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি স্কুল, বিশেষ করে যেগুলি কলকাতার প্রশাসনিক এলাকার কাছাকাছি, ইসলামি সংগঠনের হুমকির কারণে তাদের পূজা বন্ধ করতে হয়। এই সংগঠনগুলো প্রথমে মহম্মদ সাহেবের জন্মদিন পালনের দাবি জানিয়েছিল, যা রাজারহাট ইমাম কাউন্সিল একটি পূর্বশর্ত হিসেবে উপস্থাপন করেছিল। সনাতন পরম্পরায় চলে আসা মা সরস্বতীর পূজা পশ্চিমবঙ্গের অনেক বিদ্যালয়ে বন্ধ হয়ে গেছে বা শিক্ষকরা ভয়ে বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। এইসব কেন হচ্ছে? সংবিধানিক সংরক্ষণের সুবিধা নিয়ে মুসলমানরা, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও প্রকৃতপক্ষে সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজের ওপর নিজেদের শর্ত চাপিয়ে দিচ্ছে এবং এতে সমাজের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক সৃষ্টি হচ্ছে।

এমন পরিস্থিতিতে, যখন মুসলমান ও হিন্দু জনসংখ্যার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে তেমন কোনো পার্থক্য নেই এবং মুসলমান সম্প্রদায় এমন অবস্থায় নেই যে তাদের ধর্মের কারণে হিন্দু সমাজ তাদের ওপর অত্যাচার বা অধিকার খর্ব করছে— বরং হিন্দুরাই এখানে অত্যাচারিত হচ্ছে— তখন রাজ্য সরকারের উচিত দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলমান জনসংখ্যাকে সংখ্যালঘু শ্রেণী থেকে সরিয়ে মূলধারার সঙ্গে যুক্ত করা। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বড়ো ঝুঁকি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। এই দেশের সচেতন সমাজেরও কর্তব্য যে, তারা ভারত সরকার এবং অন্যান্য সংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে দাবি করে, ঠিক কতদিন দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যা সংখ্যালঘু হিসেবে গণ্য হবে? ৫০ শতাংশ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে? মনে রাখতে হবে, অঙ্কের কারণে ইতিহাস ও ভূগোল পালটায়, পালটেছে এবং এখনই সাবধান না হলে অঙ্কটা আবার পালটাবে। □

রাজ্য সরকারের কি শেষের দিন গোনা শুরু?

বিশ্বপ্রিয় দাস

অনেকেই প্রশ্ন করছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কি ইচ্ছা করে ভুল বলেন? নাকি সারাক্ষণ সামাজিক মাধ্যমে তাঁকে নিয়ে মিম বা ট্রোল তৈরি হোক সেটার দিকে লক্ষ্য রেখেই নানা রকম ভুল বকেন? বিষয়টার মধ্যে লক্ষ্য করার মতো অনেকগুলিই উপাদান আছে। সে নজরুলের মহাভারত রচনা থেকে আজকের আরজি কর কাণ্ডে ভয়ংকর এক লালসার শিকার হয়ে তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে প্রকাশ্য জন সমাবেশে নির্যাতিতার ফাঁসি চাওয়া পর্যন্ত। অনেক অনেক উপাদান নিয়ে সামাজিক মাধ্যম মেতে থাকে। তিনি সবই জানেন। হয়তো তাঁর মিডিয়া সেলের নির্দেশ বা উপদেশ আছে, যত পারেন এরকম এরকম বলবেন, আর তিনিই ছেয়ে থাকবেন গোটা সমাজমাধ্যম জুড়ে। পজিটিভ না হোক, নেগেটিভ হলেও, তাঁর মুখ সারাক্ষণ দেখবে মানুষ। সামান্য হাসলেও, তিনি কিন্তু প্রচারের আলো থেকে সরে যাবেন না। মুখ্যমন্ত্রী হয় সেই কথা রাখতেই স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে মিথ্যা বলেন। যদি তা না হয়, তাহলে তাঁকে জরুরি ভিত্তিতে কোনো এমন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন, যিনি তাঁকে বলে দেবেন, কেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে তাঁর স্মৃতি। তিনি হয়তো লক্ষ্য করেননি, তিনি যখন ভুল বলেন আর সেই ভুলটাকে নিয়ে বার বার বলতে থাকেন, সেই সময়ে মঞ্চে বসে থাকা তাঁর দলের ছোটো থেকে বড়ো মাপের একটু শিক্ষিত নেতারাও মাথা নীচু করে হাসাহাসি করেন। তিনি দলের সুপ্রিমো, দলের সর্বময় কর্ত্রী। তাঁর এহেন আচরণ তাঁদের

কাছেও অস্বস্তিকর।

আরজি করের নারকীয় ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক আচরণগুলিকে সামনে রেখে সন্দেহের বাতাবরণে জনদেবতার আদালতে তাঁকে প্রত্যাখ্যানের মানসিকতা তৈরি হয়েছে। তিনি জনমানসে যে কতটা ব্রাত্য সেটাও রাজ্যের নারীরা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সারা দেশ যখন এহেন ঘটনায় ছিঃ ছিঃ করছে, সেই সময়ে তিনি কোটি কোটি টাকা, যে জনগণের করের টাকা, সেই টাকায় অপরাধীদের আড়াল করা বা বাঁচানোর জন্য কপিল সিব্বাল বা মনু সিংভির মতো বহু আইনজীবীকে নিয়োগ করেছেন। মানুষ ইতিমধ্যেই তাঁর চালাকিটা জেনে গেছেন। তিনি দেশের সর্বোচ্চ আদালতের কাছে তারিখের পর তারিখ নিয়ে নেবেন। মামলা পিছোতে পিছোতে, একসময়ে মানুষের মন থেকে হারিয়ে যাবে। যেমন হারিয়ে গেছে বগটুই, কামদুনি, ডায়মন্ড হারবার। যেমন হারিয়ে গেছে বাম আমলের অনিতা দেওয়ান মামলা। তিনি এই খেলা খেলতে ভালোবাসেন। সাধারণের টাকা নিয়ে দোষ ঢাকার চেষ্টা করে যান। তিনি বিবেকের তাড়নায় ভোগেন না। একজন মহিলা চিকিৎসকের কুমারীত্বের চরমতম সর্বনাশ করে হত্যালীলায় মেতে উঠে, তাঁর অধীন একটি মেডিক্যাল কলেজ নারকীয় একটি ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল, তাঁর সান্ত্বনার মূল্যমান দশ লক্ষ টাকা। তার বাড়ির কারোর সঙ্গে যদি এমন ঘটত, তাঁকে যদি দশ কোটি টাকা বা তার বেশি দেবার প্রস্তাব দেওয়া হতো, মনে হয় তাঁর যা মানসিকতা তিনি নিয়ে নিতেন। তিনি নারী, তিনি নিজের বিরুদ্ধে নিজেই র‍্যালি করলেন। রাজনীতির অঙ্কে মাপার চেষ্টা করলেন, তাঁর সঙ্গে কারা আছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই, তাঁকে প্রত্যাখ্যানের চেহারা ফুটে উঠেছে সেই র‍্যালিতেই। ব্লকে ব্লকে তাঁর জনপ্রতিনিধিরা যখন সভায় গলা ফাটিয়ে মঞ্চের নীচে নেমে এলেন। সামনের গুটিকয় দর্শক দেখে, বলেই ফেললেন, যে কথাগুলি বলতে হলো, সেগুলি আমার মনের কথা নয়। তাঁর দলের শীর্ষস্থানীয় জনপ্রতিনিধি সুখেন্দু শেখর রায় বা জহর সরকাররা বেসুরো একটু। তিনি হয়তো হারে হাড়ে বুঝতে পারছেন। আর তাঁকে দলে কোণঠাসা করার প্রক্রিয়াও জোর কদমে যে শুরু হয়ে গেছে, সেটাও বেশ কিছুদিন আগে থেকেই বুঝতে শুরু করেছেন। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

মাতৃজাতি শক্তিস্বরূপিণী

সুতপা বসাক ভড়

বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মনে প্রশ্ন জাগছে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী? গর্ভাবস্থায় থাকাকালীন শুরু হয় সন্তানের মঙ্গল কামনা। জন্মগ্রহণ করার পর তার যথাযথ যত্ন নেওয়া হয়, জ্ঞান হলে তাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়। 'মানুষ হও'। সন্তান এই আশীর্বচন মাথায় নিয়ে জীবনের পথ চলা শুরু করে। তবে বিপরীত ঘটনাও যে সমাজে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার জ্বলন্ত উদাহরণ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম আরজি কর হাসপাতালের মর্মান্তিক অমানুষিক ঘটনায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই যে নির্যাতিতা মেয়েটি একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র সন্তান। মন দিয়ে পড়াশোনা এবং কঠোর পরিশ্রম করে যে ডাক্তার হয়ে মা-বাবার কষ্ট নিবারণের চেষ্টা করে। একটি সৎ মেয়ে তার কর্মস্থলের দুর্নীতিতে জড়িত না হবার জন্য নিদারুণ মূল্য দিতে বাধ্য হলো। আবার তার নির্যাতন ও হত্যার সাক্ষ্য প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টা চলছে।

সমাজের এই ক্ষত কেন? একদিকে অভাগিনীর মা-বাবার করুণ অবস্থা, অপরদিকে সত্যকে সম্পূর্ণভাবে চাপা দেওয়ার চেষ্টা, অথচ তথাকথিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনে জয়যুক্ত করে আমরা সরকার নির্বাচিত করেছি। সে সরকার একের পর এক অন্যায় করেছে এবং আমরা তার কোনো প্রতিবাদ করিনি। শিকারি পশুরা যেমন নিজের শিকার নিশ্চিন্তে উপভোগ করার জন্য কাছাকাছি হায়নাদের একটু-আধটু প্রশ্রয় দেয়, সেইরকম এই রাজ্য সরকার আমাদের দেওয়া খাজনার টাকা থেকে একটু আধটু টাকা ছুঁড়ে দিয়ে মানুষের মুখ বন্ধ করে রেখেছে।

অন্যায়ের পর অন্যায়, অত্যাচারেও মানুষ চোখ, মুখ, কান বন্ধ করে ছিল শুধুমাত্র ওই উচ্ছিষ্ট অর্থের লোভে। পরিণাম এই ভয়ংকর হত্যা! এতই ভয়ংকর যে, পরিবার-সমাজ-দেশ মেনে নিতে পারছে না। প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে সর্বস্তরে। সুবিচারের আশায় মানুষ দিন গুনছে।

বহুদিন ধরে সহ্য করার পরে বর্তমানে মানুষ প্রতিবাদে পথে নেমেছে। তবে এই স্বৈরাচারিণীর দীর্ঘ শাসনকালে নিরপরাধ কত মানুষ যে অত্যাচারের শিকার হয়েছেন, তার হিসাব কে রাখে? আজ নারী সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, কারণ তাদের সবার বুকে একইরকম ব্যাথা অনুভব হচ্ছে, অথচ নিকট অতীতেও এমন বহু দুর্ঘটনা ঘটেছে যা আমরা ভুলে গেছি বা জোর করে, ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে ঘটনার সত্যতা সকলের সামনে উঠে এসেছে। লজ্জার কথা, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নির্যাতিতা মহিলাদের জন্য রেট চার্ট তৈরি করেছেন।

আসলে আমরা ঐক্যবদ্ধ হই না, সেজন্য বারবার অত্যাচারিত হই। অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি না। অস্ত্রকে আমরা দূরে সরিয়ে রেখেছি, সেজন্য প্রয়োজনের সময় আমাদের বাড়িতে সাপ মারার লাঠিও খুঁজে পাই না। একের পর এক অন্যায়কে ক্ষমা করতে করতে, নিজেরাই ক্ষমার অযোগ্য হয়ে উঠেছি। অতি সন্তর্পণে মা-দুর্গার হাতের অস্ত্র সরিয়ে দিচ্ছি। দশপ্রহরণধারিণীকে নিরস্ত্র করতে গিয়ে আমরা নিজেরাই অসুরক্ষিত।

ভাববার সময় এসেছে। সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অন্যায়কে মুখ বুজে সহ্য করাও অন্যায়— এই বোধ নতুন প্রজন্মকেও শেখাতে হবে। দেশ ও দশের কল্যাণের জন্য মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, কারণ আমরা এই দেশে ও দশেরই অংশমাত্র। অতীতে মায়েদের অনেক অস্ত্র ছিল বাড়ির ভেতর, রান্নাঘরের মধ্যেই। আমরা নারীরা অবশ্যই তাঁদের অনুসরণ করব। শক্তি আমাদের আরাধ্যা। আমরা সেই শক্তির অংশ, সুতরাং দুর্বল, অবলার পরিবর্তে আমাদের আত্মপ্রকাশ হোক শক্তিরূপে; যে শক্তি সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, ঐক্যের জন্য প্রতিবদ্ধ। □

কিশোরী বয়সে পিরিয়ডসের সমস্যায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

মেয়েকে নিয়ে চিন্তিত আদৃতা। কারণ সাতদিন পেরিয়ে গেলেও মেয়ের পিরিয়ডস চলছে এখনও। বছর এগারোয় কিশোরীর সদ্যই ঋতুচক্র শুরু হয়েছে। অনভ্যস্ত কিশোরীর অস্বস্তি আরও বেড়েছে বেশিদিন ধরে তা চলায়। স্কুলে না যেতে চাওয়ার পাশাপাশি স্বাভাবিক কাজকর্মেও অনীহা প্রকাশ করছে সে। এই চিত্র শুধু আদৃতা বা তাঁর মেয়ের নয়। বহু কিশোরীর ঋতুচক্র নিয়ে চিন্তিত থাকেন তাদের অভিভাবকেরা। বেশিদিন ধরে চলা, পরিমাণে বেশি, পেটে ব্যথার মতো একাধিক সমস্যায় জেরবার হয় অনেকে। এর কিছু সমস্যা কিছুদিন পরে ঠিক হয়ে গেলেও কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় চিকিৎসার। আবার কীভাবে ওই ক'টা দিন অস্বস্তি কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যাবে, তার জন্য প্রয়োজন হতে পারে কাউন্সেলিঙেরও।

কিশোরীদের যখন প্রথম ঋতুচক্র শুরু হয়, তখন কিছু কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন, পিরিয়ডস হতে পারে অনিয়মিত। প্রতি মাসে হওয়ার বদলে বাদ যেতে পারে কিছু মাস। তবে চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, এই বিষয়টি অস্বাভাবিক কিছু নয়। তখনও ডিম্বাশয় থাকে অপরিণত, হরমোন ক্ষরণও নিয়ন্ত্রিত না হওয়ার ফলে কোনও মাসে পিরিয়ডস না-ও হতে পারে। চিকিৎসা পরিভাষায় একে অ্যানোভুলেটরি সাইকল বলা হয়। এছাড়া, বেশিদিন ধরে বা অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের সমস্যা দেখা দেয়। একে বলা হয় পিউবার্টি মেনোরেজিয়া। কোনও কিশোরীর এই সমস্যা ধরা পড়লে তার চিকিৎসা অবশ্যই দরকার বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসকেরা। আবার পিরিয়ডস ঠিক মতো হলেও সেই রক্ত দেহের বাইরে আসতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হলে প্রস্রাবে সমস্যা দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি পর্যন্ত করতে হতে পারে।

পিউবার্টি মেনোরেজিয়া কী?

মাসে একবারের বেশি পিরিয়ডস, টানা সাত দিনের বেশি চলা বা অতিরিক্ত ক্ষরণ দেখা গেলে সেটি মেনোরেজিয়া হতে পারে। তাছাড়া ক্লটিঙের সমস্যাও থাকতে পারে। স্ত্রীরোগ চিকিৎসক অভিনিবেশ চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'স্বাভাবিকভাবে একটি চক্রে ৫ থেকে ৩০ মিলিলিটার রক্ত বেরোয় দুই থেকে সাতদিন ধরে। এর বেশি রক্তক্ষরণ বা এর বেশি দিন ধরে পিরিয়ডস চললে তাকে মেনোরেজিয়া বলা হয়।' তবে চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, এই পরিমাণ বোঝা সাধারণের পক্ষে সহজ নয়। তার বদলে লক্ষ্য রাখতে হবে, দিনে কতবার স্যানিটারি ন্যাপকিন বদলের প্রয়োজন হচ্ছে? দু'-তিন ঘণ্টা পরেই ন্যাপকিন বদলাতে হলে, সতর্ক হতে হবে তখনই। এছাড়া, মাথা ঘোরা, ঘেমে যাওয়া, ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়ার মতো উপসর্গও নজরে রাখতে হবে।

মেনোরেজিয়ার কারণ : মেনোরেজিয়ার একাধিক কারণ থাকতে পারে। স্ত্রীরোগ চিকিৎসক চন্দ্রিমা দাশগুপ্ত জানাচ্ছেন, তার মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই কারণ হরমোনের অনিয়মিত ক্ষরণ। হাইপোথাইরয়েড, পলিপ, জরায়ুর সমস্যাও থাকতে পারে। আবার প্লেটলেট কম থাকা, রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়ার সমস্যা, রক্তের ক্যানসারের মতো কারণ থাকলে দেখা যেতে পারে মেনোরেজিয়া।

মেনোরেজিয়ার প্রভাব : মেনোরেজিয়ার চিকিৎসা না হলে দেহ থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষণের জেরে দেখা দিতে পারে অ্যানিমিয়া। বাড়ন্ত বয়সের কিশোরীদের মধ্যে অ্যানিমিয়ার ফলে ক্লান্তি, দুর্বলতা, পড়াশোনা ও খেলাধুলোয় অনীহা, মুড সুইঙের মতো উপসর্গ থাকতে পারে। ব্যাহত হতে পারে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। রক্তাল্পতার চিকিৎসা না হলে তা থেকে স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে বাধা, মাথা ঘোরা, হার্টফেল, এমনকী মৃত্যুও হতে পারে।

চিকিৎসা কী : মেনোরেজিয়ার কারণ নির্ধারণ করতে চিকিৎসকরা একাধিক পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দিতে পারেন, যেমন রক্তপরীক্ষা বা আল্ট্রাসাউন্ড। এই সব পরীক্ষায় কোনও কারণ না পাওয়া গেলে তখন চিকিৎসা শুরু হয় নন-হরমোনাল ওষুধ দিয়ে। রক্তক্ষরণের তীব্রতা কমানো যেতে পারে এই ওষুধের মাধ্যমে। এই ওষুধের কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই বলে জানাচ্ছেন অভিনিবেশ চট্টোপাধ্যায়। তাতে কাজ না হলে হরমোনাল ওষুধ দেওয়া হয়। তবে বাড়ন্ত কিশোরীদের সব হরমোনাল ওষুধ দেওয়া যায় না, সে দিকে খেয়াল রাখেন চিকিৎসকেরা। এর পাশাপাশি, শরীরে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ দেখে শুরু করা হয় অ্যানিমিয়ার চিকিৎসাও। সাধারণত, আয়রন সাপ্লিমেন্ট দেওয়া হয়। এর সঙ্গেই দরকার ফলিক অ্যাসিড ও মিথাইল কোবালামাইন। তবে অনেকের সাপ্লিমেন্টে সমস্যা থাকতে পারে। তাই আয়রন সমৃদ্ধ, সুষম খাবারের উপরেও জোর দেন চিকিৎসকেরা।

পিরিয়ডসের সময়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন : চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, ঋতুচক্র শুরু হলে অনেক কিশোরীই কিছুটা ঘাবড়ে যায়। স্কুলে অপরিচ্ছন্ন শৌচাগার বা পেটে ব্যথার মতো কারণে স্কুল না যেতে চাওয়া থেকে ক'টা দিন আড়ষ্ট হয়ে থাকার মতো আচরণ করে অনেকে। এক্ষেত্রে তাদের বোঝানোর দরকার রয়েছে যে পিরিয়ডস কেন হয়, কীভাবে ওই দিনগুলিতে নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখা যাবে। কিশোরীরা পিরিয়ডসের সমস্যা নিয়ে এলে অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা এই কাউন্সেলিং করেন। পেটে ব্যথার জন্য গরম সেঁক বা ডাক্তারের পরামর্শ মতো জরায়ুর ব্যথা কমানোর ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া, জাঙ্ক ফুড এড়ানো, শরীরচর্চার অভ্যেসও গড়ে তোলার দরকার রয়েছে। এতে পরবর্তীকালে পলিসিস্টিক ওভারির মতো সমস্যা এড়ানো যেতে পারে বলে জানচ্ছেন চন্দ্রিমা দাশগুপ্ত। □

বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার হ্রাস ও বিতাড়নের ধারাবাহিকতা

ধর্মানন্দ দেব

বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমাগত হ্রাসের প্রবণতা ইতিহাসগতভাবে প্রমাণিত। ১৯০১ সালে লালন ফকিরের মৃত্যুর দশ বছর পর বাংলাদেশের হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৩৩ শতাংশ। আরও প্রায় অর্ধশতাব্দীর পর, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২২.৫ শতাংশ। ১৯৪১ সালে ব্রিটিশ ভারতের পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ২৮ শতাংশ, যা ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের প্রথম আদমশুমারিতে কমে দাঁড়ায় প্রায় ২২ শতাংশে। দেশভাগের পর, অনেক হিন্দু ভারতে চলে আসেন। হিন্দু জনসংখ্যা কমার এই প্রবণতা ১৯০১ সাল থেকে আদমশুমারির প্রতিটি দশকে পরিলক্ষিত হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'জনশুমারী ও গৃহগণনা-২০২২'-এর প্রাথমিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১৬ কোটি ৫১ লক্ষ, যা ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে চূড়ান্ত প্রতিবেদনে ১৬ কোটি ৯৮ লক্ষে দাঁড়ায়। এই প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশের ৯১ শতাংশ জনসংখ্যা শুধুমাত্র ইসলাম অনুসারী। ২০১১ সালে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ৯০.৩৯ শতাংশ এবং বর্তমানে হিন্দুরা ৭.৯৫ শতাংশ। ২০১১ সালে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৮.৫৪ শতাংশ, যা বর্তমানে আরও কমেছে। বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার সবচেয়ে বেশি চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর ও খুলনায়। সিলেট অঞ্চলে হিন্দুদের সংখ্যা সর্বাধিক ১৩.৫০ শতাংশ এবং ময়মনসিংহে সর্বনিম্ন ৩.৯২ শতাংশ। ২০০১ সালের আদমশুমারির এক বিশ্লেষণী প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ১৯৪৭ সালে দেশভাগ, ১৯৬৫ সালের ভারত- পাকিস্তান যুদ্ধ এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ হিন্দু জনসংখ্যার হ্রাসের মূল কারণ। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের পর ধর্মনিরপেক্ষ চেতনায় সকল ধর্মের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল মূলনীতি, যা ১৯৭৫ সালে মুজিব হত্যার পর রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে বাতিল হয়। ১৯৮৮ সালে এরশাদ সরকারের আমলে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২০১০ সালে সুপ্রিম কোর্ট পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে ধর্মনিরপেক্ষতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেও ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে আজও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

বাংলাদেশের অনেক হিন্দু বিশ্বাস করেন, দেশত্যাগের একটি বড়ো কারণ হলো শত্রু সম্পত্তি আইন, যা ১৯৬৫ সালে ভারত- পাকিস্তান যুদ্ধের সময় প্রণীত হয়। এই আইনটির মাধ্যমে হাজার হাজার হিন্দু পরিবার তাদের জমি হারিয়েছেন। বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রায়শই ঘটে থাকে। ১৯৯২ সালে ভারতের বাবরি ধাঁচা অপসারণের পর বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর ব্যাপক সহিংসতা ঘটে। ২০০১ সালের নির্বাচনের পরও হিন্দুদের ওপর আক্রমণ, সম্পত্তি দখল এবং নারীদের ওপর নির্যাতন দেখা যায়। সাম্প্রতিককালেও, হিন্দুদের উপাসনালয়, মন্দির এবং ঘরবাড়ি আক্রমণের শিকার হয়েছে। এই সহিংসতার ফলে অনেক হিন্দু পরিবার দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। হিন্দুদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রায়শই ক্ষুণ্ণ হয়। হিন্দুদের জমি দখল, শত্রু সম্পত্তি আইন এবং প্রশাসনিক হয়রানির মাধ্যমে তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। শত্রু সম্পত্তি আইন থেকে অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রবর্তন হলেও বহু মামলা ও অভিযোগ বছরের পর বছর ঝুলে রয়েছে, যা হিন্দুদের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও ভয় সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বাংলাদেশের প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলেও বাস্তবে দেখা যায়, হিন্দুদের উপর আক্রমণের ঘটনাগুলির যথাযথ বিচার প্রায়ই হয় না। আজও হচ্ছে না। রাজনৈতিক প্রভাব এবং প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্বের কারণে হামলাকারীরা আইনের আওতায় আসে না।

বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার ক্রমহ্রাস বন্ধ করতে হলে, প্রশাসনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বাতিল করে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি কার্যকর করতে হবে। সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার ও বৈষম্যের প্রতিটি ঘটনার দ্রুত বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলিকে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা ও সমানাধিকারের প্রশ্নে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিতে হবে। বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার ক্রমহ্রাস একটি গভীর সংকটের প্রতিফলন, যা ওই দেশের সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতার অভাব এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার ফল। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশকে একটি দৃঢ় এবং সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে হবে, যাতে হিন্দুরা মানুষরা আবার নিরাপদ ও সম্মানের সঙ্গে তাদের জীবনযাপন করতে পারে।

বাংলাদেশের হিন্দুদের সাহস দেখাতে হবে, প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে। তাইতো আজ বাংলাদেশের নির্যাতিত মানুষরা আওয়াজ তুলেছেন 'আমার মাটি, আমার মা, এই দেশ ছাড়ব না'। আরও গর্বের বিষয় হলো যে, এই সবের নেতৃত্বে অল্পবয়সি হিন্দু মেয়েরা! বড়ো বড়ো মিছিল ও জমায়েত হচ্ছে ঢাকা, চট্টগ্রাম-সহ নানা স্থানে। তাঁদের প্রশ্ন, স্বাধীনতা সংগ্রামে কি হিন্দদের কোনও অবদান নেই? দুর্বৃত্তদের পালটা মার দেওয়ারও হুঁশিয়ারি তাঁদের মুখে। বাংলাদেশের হিন্দুদের ঘুরে দাঁড়াবার এই ছবি সত্যিই নতুন। পারবেন কি তাঁরা প্রতিরোধের মানসিকতা ধরে রাখতে? অনেকাংশে নির্ভর করছে সরকারের নীতির উপর। বাংলাদেশের বর্তমান কর্ণধারদের উচিত, এটাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে নিয়ে নিজভূমে বাঁচতে চাওয়া মানুষগুলির হাত শক্ত করা। তাতে বাংলাদেশেরই ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে এবং তা সহায়ক হবে তার ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পক্ষে।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

গ্রেটার ইসলামি বাংলাদেশের গোপন কথা

প্রকাশ চন্দ্র দাশ

গ্রেটার ইসলামি বাংলাদেশ— এই শব্দটা এখন কথার কথা নয়; বোমা, বারুদ, জনসংখ্যার বিস্ফোরণের কারণে আকাশ বাতাস কম্পিত। এর পরও এটা গোপন বা অজানা হতে পারে না। অন্ধ দেখতে পাচ্ছে না, বধির শুনতে পাচ্ছে না। এছাড়া যদি কেউ না দেখতে পায় তাকে মরুভূমির উটপাখি বলতে হবে যে ঝড় দেখে মাথা বালির মধ্যে গুঁজে রয়েছে।

১৪০০ বছর আগে মরুদস্যুদের যে যাত্রা শুরু হয়েছে তার আগুন সম্পূর্ণ বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে আজকের কেন্দ্র শুধুমাত্র বঙ্গ। ২৯ জুলাই ১৯৪৬ মুম্বইতে মুসলিম লিগের অধিবেশন ডাকলেন জিন্না এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিলেন। ১৬, ১৭, ১৮ আগস্ট কলকাতায় চলল হিন্দু নরসংহার। ১০ অক্টোবর কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন নোয়াখালিতে প্রায় পাঁচ হাজার বাঙ্গালি হিন্দু হত্যা, ধর্মান্তর ও ধর্ষণ। ১৯৭১-এ পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানি সেনা ও বাংলাদেশি রাজাকারদের দ্বারা অসংখ্য হিন্দু হত্যা এবং মা-বোন ধর্ষিতা। এই লেখকের পিতা-পিতামহও খান সেনাদের হাত থেকে নিস্তার পায়নি। পিতামহ সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁকে আশ্রমেই গুলি করে মারা হয়েছে। পিতাকে করা গুলিটা তাঁর পিঠে লেগেছিল, কলকাতায় এনে চিকিৎসা করা হয়, তারপর সুস্থ হয়ে ওঠেন।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাজন বলে থাকি কিন্তু এটা হলো ভারত মায়ের অঙ্গচ্ছেদন। পুরো দেশটা কিন্তু দু'ভাগ হয়নি। মনে রাখতে হবে, ভারতের সীমান্ত অঞ্চল বা সীমা রাজ্যগুলি ধীরে ধীরে কাটা হয়েছে। আফগানিস্তান হলো, পাকিস্তান হলো, বাংলাদেশ হলো। কিন্তু কোনো মুসলমান ভারত ছাড়ল না। ভারতে যে মুসলমান থেকে গেল তারা আবার ভারতের মধ্যে ছোটো ছোটো মিনি পাকিস্তান গড়ে তুলতে ব্যস্ত। আমাদের কলকাতার বর্তমান মেয়র পাকিস্তানের এক সাংবাদিককে মিনি পাকিস্তান দেখিয়েছেন। সম্প্রতি একটি বক্তব্যে তিনি বলেছেন যারা ইসলামে জন্মায়নি তাদের ইসলামি দাওয়াত দিয়ে ইসলামে দীক্ষিত করতে হবে।

১৯৭১ সালে বঙ্গমাতার অঙ্গ কেটে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে বাংলাদেশের জন্ম তার মধ্যেই নিহিত গ্রেটার বাংলাদেশের বীজ। মওলানা ভাসানি বলেছিলেন, 'অসম আমার, পশ্চিমবঙ্গ আমার, ত্রিপুরাও আমার। এগুলো ভারতের কবল থেকে ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মানচিত্র পূর্ণতা পাবে না।' ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান এ একে নিয়াজি বলেছিলেন বাংলাদেশের সকল হিন্দু মহিলার পেটে ইসলামি বীজ ঢুকিয়ে দিতে। অর্থাৎ ধর্ষণ করতে। তার কথা মতো কয়েক লক্ষ মা-বোনকে রীতিমতো মিলিটারি ক্যাম্পে ধর্ষণ করা হয়েছে। ইলা মিত্রকে নির্যাতিত হতে

হয়েছে। তার গোপনাঙ্গে গরম ডিম ঢুকিয়ে অত্যাচার করেছে। হিন্দু নারীদের উপর এমন অত্যাচার আজ ২০২৪-এও হয়ে চলেছে। ২০০১ সালে পূর্ণিমা শীলকে ৩০ জন জেহাদি ধর্ষণ করেছে। তসলিমা নাসরিন এনিয়ে কবিতা লিখেছেন। প্রশান্ত শূর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর বাবাকে জীবন্ত কবর দিয়েছে জেহাদিরা। এই ইতিহাস জানার জন্য তিনটি বইয়ের নামোল্লেখ করব :

১. Bengal's Hindu Holocaust : The Partition of India & Its Aftermath– Sachi Ghosh Dastidar.

২. My People, Uprooted : The Exodus of Hindus from East Pakistan and Bangladesh– Tathagata Roy. বাংলায় 'যা ছিল আমার দেশ।'

৩. 1946 Great Calcutta Killings and Noakhali Genocide Dr. Dinesh Chandra Sinha.

বাংলাদেশে হিন্দু গণহত্যা আজও চলছে। যে মুহূর্তে এই লেখাটি পাঠক পড়বেন তখনোও চলছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত একজনও হিন্দু বেঁচে থাকবে ততক্ষণ চলবে। বেঁচে থাকা হিন্দুরা উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসবে, যতক্ষণ না বাংলাদেশ একটি তালিবানি দেশে পরিণত হচ্ছে।

প্রখ্যাত বাংলাদেশি অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাত লিখেছেন যে ২০৪৬ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য হয়ে যাবে। অর্থাৎ নোয়াখালি বাঙ্গালি হিন্দু গণহত্যার শতবর্ষ পূর্তি হবে হিন্দুশূন্য বাংলাদেশ নির্মাণ করে। বঙ্গে এই হিন্দু গণহত্যা শুরু হয়েছে সেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে বক্তিয়ার খিলজির আক্রমণ থেকেই। হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেই তাদের মজহবি সাম্রাজ্য বিস্তারের শুরু, সেই থেকেই শুরু হিন্দু গণহত্যার। হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে জারি রয়েছে জেহাদ।

মনে রাখতে হবে, এসব ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পাঠকদের অনুরোধ রইল আর একটি বই— MA Khan-এর লেখা Islamic Jihad : A legacy of Forced Conversion, Imperialism and Slavery' (iUniverse, Inc : New York. Bloomington) নামক বইটি পড়ার। এই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ— 'জিহাদ : জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরণ, সাম্রাজ্যবাদ ও দাসত্বের উত্তরাধিকার।' এই গ্রন্থে অনুবাদক শামসুজ্জোহা মানিক (ঢাকা) বলেছেন, ইসলামের প্রাণশক্তি হচ্ছে জিহাদ। জিহাদের মাধ্যমে মদিনা থেকে তার বিজয়ী রূপে আত্মপ্রকাশ, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা। জিহাদের মাধ্যমে ঘটেছে ধর্মের নামে পাইকারি ভাবে পরের সম্পদ ও সম্পত্তি লুণ্ঠন ও আত্মসাৎকরণ, নারী ধর্ষণ, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাফের বা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী আখ্যায়িত করে আক্রমণ ও হত্যা।

আজ হঠাৎ ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বাংলাদেশের পটপরিবর্তন আমাদের মনকে নাড়া দিয়েছে বলেই এই প্রবন্ধের অবতারণা নয়।

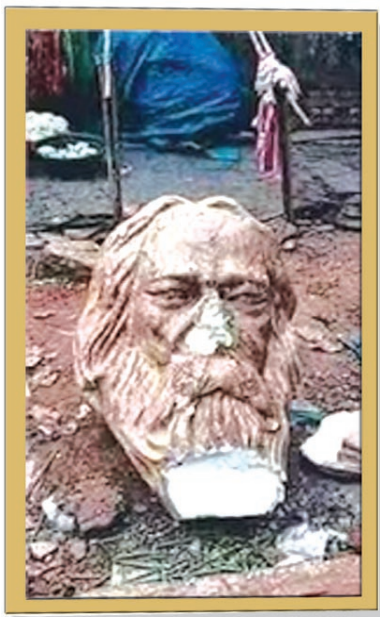

ভারতকে খণ্ড খণ্ড করে ভাঙার চক্রান্ত আজকের নয়। ১৯৪৬ সালে কলকাতার যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘটিয়েছিল, তার রূপ পালটেছে। তাই মাঝে মাঝেই সেই আঘাত বিভিন্ন ভাবে নেমে আসছে। মনে রাখতে হবে, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত ৪০৯৬.৭ কিলোমিটার যা পাঁচটি রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৭১ সালে ভারতের ১৬ হাজার সৈন্যের প্রাণ বিসর্জন, ৫০ হাজার সৈন্য আহত হওয়ার বিনিময়ে এবং ৯৩ হাজার পাকিস্তানি খান সেনাকে একবছর খাইয়ে যে বাংলাদেশ উপহার দিয়েছে ভারত, সেই বাংলাদেশ ১৯৮৮ সালের ৯ জুন ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের ঘোষণা করল। এর ফলে বাংলাদেশে অনবরত চলছে হিন্দু বিতাড়ন। পাশাপাশি ভারতে চলছে বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশ। বর্তমানে তার সঙ্গে যোগ হয়েছে রোহিঙ্গা মুসলমানদের অনুপ্রবেশ। ভোটভিখারি রাজনীতিকদের দয়ায় তারা আজ ভারতের প্রতিটি রাজ্যে পৌঁছে গেছে।

অনুপ্রবেশ নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রকাশ জয়সোয়াল ১৪ জুলাই ২০০৫ রাজ্যওয়ারি রিপোর্ট পেশ করেছিলেন, তাতে দেখা গেছে— অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা অসমে ৫০ লক্ষ, পশ্চিমবঙ্গে ৫৭ লক্ষ, ত্রিপুরায় ৩ লক্ষ ২৫ হাজার, বিহারে ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার এবং মহারাষ্ট্রে ২০ হাজার ৪০০।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ হিন্দি দৈনিক সন্মার্গের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা গিয়েছে ২২ হাজার পাকিস্তানি ভারতে এসে হারিয়ে গেছে। সরকারি হিসেবে এই সংখ্যা ১০ হাজার বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শিবপ্রসাদ রায়ের লেখা 'অনুপ্রবেশ : বিনাযুদ্ধে ভারত দখল'--- পুস্তিকাটি প্রণিধান যোগ্য।

৯ আগস্ট ২০২৪ বর্তমান পত্রিকার প্রথম পাতায় আলোচ্য বিষয়ে একটি খবর--- 'ইসলামিক বাংলাস্তানের লক্ষ্যে জামাত : বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর-পূর্ব ভারত, বিহারের কাটিহার-কিষাণগঞ্জ'। খবরটি পড়ে বোঝা যায় আপাতত এই অঞ্চলগুলিকে নিয়ে ইসলামিক বাংলাস্তানের লক্ষ্যে জেহাদিদের গোপন পরিকল্পনার কথা। তাতে 'নতুন করে ভারত-ভাগের ষড়যন্ত্র চলছে' এমন একটি লেখা ১৬ এপ্রিল ২০০৫ বর্তমান পত্রিকায় মানচিত্র-সহ জনমত কলমে প্রকাশিত হয়।

গ্রেটার ইসলামিক বাংলাদেশের বাস্তবায়ন গ্রাউন্ড জিরোতে কী ঘটছে, তার সম্পূর্ণ বিবরণ এই ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। প্রতিনিয়ত হিন্দু বিতাড়ন চলছে, আমরা এক একটা ঘটনা দেখছি

আর পাশ ফিরে শুয়ে বলছি, তাতে আমার কী আছে? ২ এপ্রিল ২০০৪ চট্টগ্রামে অস্ত্রশস্ত্র সমেত ১০টি ট্রাক ধরা পড়েছিল, তাদের গন্তব্য ছিল ভারত। ৯ জানুয়ারি ২০০৫-এ মুম্বাইতে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর প্রাক্তন ডিরেক্টর ভিজি বৈদ্য এক সভায় বলেন, 'উত্তরপূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্যে যে ভাবে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে ভবিষ্যতে ওই অঞ্চলে আরও একটি মুসলমান দেশ তৈরি হলে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না।'

পশ্চিমবঙ্গে কী ঘটছে? পশ্চিমবঙ্গ কি পশ্চিম বাংলাদেশ হয়ে যাবে? এই প্রশ্ন গত কয়েক দশক ধরে মানুষের মুখে মুখে। চারপাশে যা ঘটছে তাতে এরকম ভাবনা খুব একটা 'সাম্প্রদায়িক' বলে সবাই উড়িয়ে দিচ্ছেন না। আবার সাহস করে বলার লোকও হাতে গোনা। মুর্শিদাবাদে শরিয়তি আদালত খুবই চালু। ২০০৮-এর একটি ঘটনা। শরিয়তি আদালত একটি হিন্দু যুবককে মৃত্যুদণ্ড দেয় এবং তার মাথা কেটে তা কার্যকরী করে। (The Telegraph—Sunday, August 3, 2004)। চোপড়াতে গত ১ জুলাই ২০২৪ এক মহিলাকে প্রকাশ্য রাস্তায় পেটানো হয়। কাজটি করে লোকাল গুন্ডা তাজমুল (জেসিবি)। সমর্থন করে তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমান। যুক্তি দেন শরিয়া বিধানের। ২১ নভেম্বর ২০০৭ তসলিমা নাসরিনের বিতাড়নের দাবিতে ইসলামি মোল্লাবাদীরা মধ্য কলকাতার মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে সারাদিন ধরে গাড়ি, দোকান ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করে।

মনে রাখতে হবে, পরিস্থিতি সামাল দিতে সেনা নামাতে হয়েছিল। নারীর অপমানে রামায়ণ-মহাভারত ঘটেছে। আশ্রয় প্রার্থী হয়ে আসা বাংলা ভাষায় কথা বলা এক নারীকে আমরা আশ্রয় দিতে পারিনি, তাই পশ্চিমবঙ্গ কোন পথে তা ভাবতে হবে।

২০০৯ সালের ৬-৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতার প্রাণকেন্দ্র উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন পত্রিকা স্টেটসম্যান অফিসকে ঘিরে চলল ইসলামিক তাণ্ডব। ৫ তারিখ ব্রিটিশ সাংবাদিকের একটি লেখা পুনঃপ্রকাশিত হয় তাতে মুসলমান জেহাদিরা দাঙ্গায় নেমে পড়ে। সম্পাদককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে, পরে জামিনে ছাড়া পান।

২০১০ সালের ৬-৭-৮ সেপ্টেম্বর দেগঙ্গা অঞ্চলে তিনদিন ধরে দফায় দফায় দাঙ্গা চলেছিল, নামানো হয়েছিল সেনা। আনন্দবাজার জানায় পুড়ল ৫০টি বাড়ি ও দোকান ৩০০টি বাড়িতে চলল ভাঙচুর। ২০১৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ক্যানিঙের নলিয়াখালি অঞ্চলে ৩০০ হিন্দু বাড়ি জ্বালিয়ে দিল মুসলমানেরা। একজন ইমামের ডাকাতির কারণে গুলিতে প্রাণ যায়। পশ্চিমবঙ্গে নারী ধর্ষণ নিত্যকার ঘটনা--- ধানতলা, বানতলা, ঘোকসাডাঙ্গা, বিরাটি, কাটোয়া, পার্কস্ট্রিট, কামদুনি। ২০১৩ সালের ৭ জুন কামদুনি গ্রামে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী স্থানীয় ঘোষ পরিবারের মেয়েকে নির্মমভাবে ধর্ষণ করে দু'পা চিরে হত্যা করা হয়। শাস্তির দূতদের কোনও শাস্তি হয়নি।

এবছরই কিছুদিন আগে রাজ্যের তৃণমূল বিধায়ক নির্বাচনী প্রচারে বলেন তোমরা হিন্দুরা ৩০ শতাংশ, আমরা ৭০ শতাংশ, কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব। জুলাই মাসে কলকাতা মেয়র ববি হাকিম সাহেব বলেন, দুর্ভাগ্য যারা ইসলামে জন্মাননি, তাদের ইসলামি দাওয়াত অর্থাৎ সকলকে ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার আমন্ত্রণ। প্রাক্তন আইপিএস নজরুল সাহেব ইসলামের করণীয় একটি বই লিখেছেন। সেখানে তিনি বলছেন পশ্চিমবঙ্গের একজন মুসলমান মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়োজন।

২০১৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাজাবাজারে বাস চাপা পড়ে বছর পঞ্চাশের মহম্মদ আকিল নামের এক ব্যক্তির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ৪৬টি বাস, ১১টি গাড়ি, ২টি ট্রাম ভাঙচুর হয়। সিএএ নিয়ে মালদা, মুর্শিদাবাদ, উলুবেড়িয়ায় ট্রেন-বাস, স্টেশন ভাঙচুর, আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে পুরো পশ্চিমবঙ্গটা একটা বধ্যভূমিতে পরিণত করেছিল মুসলমানরা। ২০১৬ সালের ৩ জানুয়ারি, মালদহের কালিয়াচকে হজরত মহম্মদের অসম্মানের বিরুদ্ধে জড়ো হয় লক্ষাধিক মুসলমান। অসম্মানের ঘটনাটি ছিল উত্তরপ্রদেশের অখ্যাত নেতার একটি বিবৃতি। সেই ঘটনায় হাজার কিলোমিটার দূরে একমাস পরে লক্ষাধিক মুসলমান জমায়েত হয় কী কারণে? তারপর সেখানে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো থানা-পুলিশ-সহ বিএসএফের ৩০-৩৫টি গাড়ি, হিন্দুর দোকানপাট। পুড়ল হিন্দুর বাড়িঘর মন্দির। মনে হলো পশ্চিমবঙ্গটা পাকিস্তান বা বাংলাদেশ হয়ে গেছে।

২০১১ সালের ৬ মে কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম মৌলানা বরকতি ইসলামি সন্ত্রাসবাদী ওসামা বিন লাদেনের শান্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করে। ৩০ মার্চ ২০১৩-তে ১৪টি মুসলমান সংগঠনের পক্ষে প্রায় ২৫ হাজার মুসলমান কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে বাংলাদেশের গণহত্যাকারীদের সমর্থনে সভা করে। সম্প্রতি বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের নামে চলে গণহত্যা, নির্বাচিত সরকার উৎখাত, সর্বোপরি হিন্দুদের উপর নেমে আসে বর্বরোচিত আক্রমণ। এই জঙ্গি ছাত্র আন্দোলনের সমর্থনেও কলকাতায় মিছিল তথা মিষ্টি বিতরণ করে বিজয় উল্লাস হয়। খাগড়াগড় থেকে কালিয়াচক--- এগুলি ইসলামি বাংলাদেশের গোপন কথা নয়, এক বাস্তব সত্য।

রামমোহন রায় সত্যি কথাই বলে গিয়েছেন যে, এক দৈব আশীর্বাদের জন্য ইংরেজদের কৃপায় আমরা বিদেশি অত্যাচারী ইসলামি শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম। ভারতীয় তথা হিন্দু সমাজের তা প্রতিরোধ করার শক্তি ছিল না। পশ্চিমবঙ্গকে আবার যখন ইসলামি শাসনের আওতায় আনার জোরদার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে তখনও কি আমরা আবার দৈব আশীর্বাদের অপেক্ষায় থাকব? নাকি যে শ্যামাপ্রসাদ আমাদের একটি ইসলামমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ উপহার দিয়েছিলেন, সেই পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচানোর জন্য তাঁর প্রদর্শিত পথ— অন্যায়ের প্রতিবাদ কর, প্রতিকার কর, প্রয়োজনে নাও প্রতিশোধের পথে হাটবো? শেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাবধানবাণীর উল্লেখ করতে হয়— 'পাপের প্রধান আশ্রয় দুর্বলের মধ্যে। অতএব মুসলমান যদি মারে আর আমরা পড়ে পড়ে মার খাই তবে জানব এ সম্ভব করেছে শুধু আমাদের দুর্বলতা। আপনার জন্যেও প্রতিবেশীর জন্যেও আমাদের নিজেদের দুর্বলতা দূর করতে হবে। আমরা প্রতিবেশীদের কাছে আপিল করতে পারি, তোমরা ক্রূর হয়ো না, তোমরা ভালো হও, নরহত্যার উপর কোনো ধর্মের ভিত্তি হতে পারে না, কিন্তু সে আপিল যে দুর্বলের কান্না। বায়ুমণ্ডলে বাতাস লঘু হয়ে এলে ঝড় যেমন আপনিই আসে— কেউ বাধা দিতে পারে না। কিছুক্ষণের জন্য হয়তো একটা উপলক্ষ্য নিয়ে পরস্পর কৃত্রিম বন্ধুত্বে আবদ্ধ হতে পারি। কিন্তু চিরকালের জন্য তা হয় না। যে মাটিতে কণ্টকতরু ওঠে সে মাটিকে যতক্ষণ শোধন করা না হয় ততক্ষণ তো কোনো ফল হবে না'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রবন্ধ থেকে)। সুতরাং বৃহত্তর ইসলামি বাংলাস্তান রুখতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দুদের এখনই রুখে দাঁড়াতে হবে, নতুবা ধ্বংস দেখার অপেক্ষায় থাকতে হবে।

সামাজিক সদ্ভাবনার উদ্যোগে রাখিবন্ধন এবং বীর চুরকা মুর্মু বলিদান স্মরণ অনুষ্ঠান

সামাজিক সদভাবনার দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে গত ২০ আগস্ট রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রাদেশিক কার্যালয় কেশব ভবনে বীর চুরকা মুর্মু বলিদান দিবস স্মরণের সঙ্গে অনুষ্ঠিত পালিত হলো রাখিবন্ধন অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদা প্রসাদ পাল, অখিল ভারতীয় ডোম সমাজের প্রমুখ কালীচরণ মল্লিক, পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সভাপতি ডাঃ রমাকান্ত মুর্মু। প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন সামাজিক সদ্ভাবনার অখিল ভারতীয় টোলির সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিএসএফ জওয়ানদের সহযোগিতা করতে করতে দক্ষিণদিনাজপুর জেলার চকরাম প্রসাদ গ্রামের শাখার মুখ্যশিক্ষক বীর চুরকা মুর্মুর বলিদানের কাহিনি এবং সামাজিক একতার প্রতীক রাখিবন্ধনের বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন বক্তারা। সকল বক্তাই নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচয়ের গণ্ডী পেরিয়ে হিন্দু নামে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। তারা বলেন, যারা নিজেদের ভারতমায়ের সন্তান বলে মনে করেন, তাঁরা সবাই এই দেশের আদিবাসী বা প্রাচীন বাসিন্দা, তাঁরা সবাই ভারতীয়, সবাই এক ও অভিন্ন।

সিউড়ীতে তারাশঙ্কর-স্মরণে সাহিত্য বৈঠক

গত ১৩ আগস্ট সিউড়ী পাইকপাড়া সরোজিনী দেবী সরস্বতী শিশুমন্দিরে তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্যসমাজের পক্ষ থেকে কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয়ে— ভারত ও জাপান দুই দেশের দুই গবেষকের এক আন্তর্জাতিক সাহিত্য বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ওই সভায় মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন— জাপানি গবেষক ড. মাসায়ুইকি ওনিশি। সভায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন প্রাক্তন জাতীয় গবেষক ও তারাশঙ্কর জীবনীকার ড. দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলঙের ইংরেজি ও বিদেশি ভাষা শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় (ইএফএসইউ)-এর অধ্যাপক ড. সজল দে।

সভায় পৌরোহিত্য করেন বিপিন মুখোপাধ্যায়। এই সভায় ড. ওনিশি তাঁর তারাশঙ্কর অনুরাগ, অনুসন্ধান ও অনুবাদের কথা সাবলীলভাবে বাংলা ভাষায় তুলে ধরেন। অধ্যাপক ড. সজল দে তারাশঙ্কর অনুবাদের গুরুত্ব ও ঘাটতির কথা তুলে ধরেন। তারাশঙ্কর-জীবনীকার ড. দেবাশিস মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, তারাশঙ্কর তাঁর জন্মভূমির মাটি ও মানুষের মধ্য দিয়ে বিশ্বমানবতাকে দেখেছিলেন এবং সেই জন্য বিদেশে তাঁর সাহিত্যের সমাদর ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তিনি বলেন, চারটি মহাদেশের বিভিন্ন দেশে তারাশঙ্কর অনুবাদ-গবেষণা চলছে এবং বিভিন্ন জার্নালে, পত্রপত্রিকায় সেই সাহিত্যের রিভিউ প্রকাশিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে পরিবেশিত হয় সরস্বতী শিশুমন্দিরের ছাত্রীদের ভারতীয় নৃত্য। উপস্থিত প্রায় একশো ছুঁই ছুঁই শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো এই অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। সভা পরিচালনা করেন সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নবগোপাল রায়।

ফঃ ৪

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে সাধু-সন্তদের উপস্থিতিতে হিন্দু ধর্ম মহাসম্মেলন

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে, পূজ্য সাধু-সন্তদের উপস্থিতিতে গত ১৭ আগস্ট কলকাতায় শ্যামবাজার মেট্রো

স্টেশনের ২ নম্বর গেটের সম্মুখে, 'সনাতন সংস্কৃতি সংসদ'-এর উদ্যোগে দুপুর ৩টায় অনুষ্ঠিত হয় 'হিন্দুধর্ম মহাসম্মেলন'। এই মহাসম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য সাধুসন্ত, বিভিন্ন সংগঠনের কার্যকর্তা ও অগণিত সাধারণ মানুষ। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন স্বামী সারদাত্মানন্দজী মহারাজ (আলমবাজার মঠ), তেজসানন্দ গিরি মহারাজ (ভোলা গিরি আশ্রম, হরিদ্বার), ড. গোপাল ক্ষেত্রী (ভবা পাগলা আশ্রম, দীঘা), প্রেমানন্দ দাস বাবাজী (রাধাকুণ্ড, বৃন্দাবন), শ্রীমৎ স্বামী সর্বানন্দ অবধূত (মহানির্বাণ মঠ, কলকাতা), সন্ন্যাসিনী আত্মস্থানানন্দময়ী মাতাজী (প্রণব কন্যা সঙ্ঘ, হৃদয়পুর), সাধ্বী কল্যাণী গিরি (খড়্গপুর), সুখেন্দু গায়েন (মতুয়া মহাসঙ্ঘ), ড. জিষ্ণু বসু (বিশিষ্ট বিজ্ঞানী), হিরণ্ময় গোস্বামী (বৃন্দাবন), সঞ্জয় শাস্ত্রী (খড়দহ) এবং শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ (প্রেম মন্দির আশ্রম, রিষড়া)। সম্মেলনের প্রধান বক্তা ছিলেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ (ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ)। এই বছরের ৫ আগস্ট পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশ জুড়ে মঠ-মন্দির ধ্বংস এবং ভয়াবহ হিন্দু নির্যাতনের কথা বক্তারা তুলে ধরেন। একদা পূর্ববঙ্গ, অধুনা বাংলাদেশে হিন্দুধর্মের উপর জেহাদি শক্তির দ্বারা যে প্রবল বিপর্যয় নেমে এসেছে, হিন্দু সমাজের উপর যে ভয়াবহ আক্রমণ নেমে আসছে, জেহাদিদের হাতে যে প্রবল হিংসার শিকার হয়ে চলেছে হিন্দুরা, তার সর্বাত্মক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ডাক দিয়ে সভায় উপস্থিত সাধুসন্তরা এই কঠিন সময়ে সার্বিক হিন্দু ঐক্য ও হিন্দু জাগরণের উপর জোর দেন। তাঁরা বলেন যে হিন্দু সমাজ শান্তিপ্রিয়, তাদের কাছে অহিংসা পরম ধর্ম। কিন্তু হিন্দুঘাতক আততায়ীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সব বর্ণ-জাতি-সম্প্রদায় এক হয়ে আততায়ীদের বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধ। এই অস্থির সময়ে সমাজকে বাঁচাতে, মা-বোনেদের সম্ভ্রমহানি রুখতে এবং দেশ রক্ষার লক্ষ্যে তাই সমগ্র হিন্দু সমাজকে সংগঠিত হতে হবে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বাংলাদেশ ভারতের একটি প্রতিবেশী দেশ। সেখানে এই শোচনীয় অবস্থা ভারতের পক্ষে উদ্বেগজনক বলে জানায় সন্তসমাজ। এই সংকটের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণীকে স্মরণ করে, মঠ-মন্দিরের সীমাকে অতিক্রম করে, মহানগরের রাজপথে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্য সম্মেলনের মাধ্যমে, হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে সাধুসন্তরা জানান। ধর্মের উপর আঘাত অব্যাহত থাকলে তাঁরা বারবার পথে নামবেন, সরব হবেন বলে জানান। হিন্দু ধর্ম মহাসম্মেলন সঞ্চালনা করেন শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গনের শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ। 'বন্দে মাতরম্' গানের পর এই সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

ঝাড়গ্রাম নগরে রাখিবন্ধনে পারিবারিক মিলন

বিবেকানন্দ সেবা প্রতিষ্ঠান, ঝাড়গ্রাম-এর ব্যবস্থাপনায় গত ১৮ আগস্ট, সন্ধ্যায় রাখিপূর্ণিমার প্রাকলগ্নে ঝাড়গ্রাম নগরে স্থানীয় বলাকা রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য রাখি সম্মেলন। এই সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে অনেকগুলি পরিবারের পারিবারিক মেলবন্ধন ঘটে। ছোটো ছোটো শিশুদের গান, নাচ, আবৃত্তি, শ্লোক পাঠের পাশাপাশি বড়োরাও গান ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের অধ্যাপক রাজেশ কুমার পাণ্ডে। তিনি একতার প্রতীক রাখিবন্ধন উপলক্ষ্যে পারিবারিক মিলন এবং সেই অনুষ্ঠানে ছোটো ছোটো শিশুদের অংশগ্রহণের ভূয়সী প্রশংসার পাশাপাশি সংস্কার ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখতে পরিবারের অবদান তথা ভারতের প্রকৃত শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠান শেষে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীতের পর সকলে পরস্পরের হাতে রাখি বাঁধেন।

বাগবাজারের গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হলো সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১১ আগস্ট বাগবাজারের গৌড়ীয় মঠের সভাঘরে অনুষ্ঠিত হলো সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বার্ষিক সাধারণ সভা। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার পালক অধিকারী তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদা প্রসাদ পাল, সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের সহক্ষেত্র প্রচারক জলধর মাহাত, সংস্থার কেন্দ্রীয় সহ-সম্পাদিকা তথা প্রান্তের সহ-সভানেত্রী নীলাঞ্জনা রায়, সংস্থার প্রান্ত সভাপতি ড. সরূপ প্রসাদ ঘোষ, প্রান্তের অন্যতম সহ-সভাপতি তথা প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সুভাষ ভট্টাচার্য এবং সঙ্ঘের প্রান্ত কার্যবাহ শশাঙ্ক শেখর দে। অতিথিরা দীপ প্রজ্বলন ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের মাধ্যমে সভার সূচনা করেন এবং ভাবসংগীত পরিবেশিত হয়।

এগারোটি জেলা থেকে আগত জেলা সম্পাদকরা জেলা অনুসারে বিগত বছরে তাঁদের কার্যক্রমের বৃত্ত নিবেদন করেন এবং আগামী কার্যক্রমের রূপরেখা বর্ণনা করেন। সহ-সাধারণ সম্পাদক অমিত কুমার দে বিগত বছরের ৩৬তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। এরপর সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন। বিগত বছরের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব পেশ করেন প্রান্ত কোষাধ্যক্ষ গোপাল কুণ্ডু। দুইটিই সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

এরপর কেন্দ্রীয় সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায় বিগত বছরের সমিতি ভেঙে দিয়ে আগামী বছরের নতুন সমিতি গঠন করেন। নতুন সমিতি সভাপতি— ড. সরূপ প্রসাদ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক— তিলক সেনগুপ্ত, সহ-সাধারণ সম্পাদক— অমিত কুমার দে এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে গোপাল কুণ্ডুর নাম ঘোষণা করেন শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায় এবং এর সঙ্গে তিনি জানান যে কেন্দ্রীয় সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে বাকি সমিতির সদস্যদের নাম আগামী অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় সাধারণ সভার পর ঘোষণা করা হবে। শ্রীমতী রায় বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজে মহিলা সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মহিলাদের জাগ্রত হওয়ার আবেদন জানান।

প্রান্ত পরামর্শদাতা ও কেন্দ্রীয় কোষটোলীর সদস্য ভরত কুণ্ডু ১৭ আগস্ট শ্যামবাজার মোড়ে সাধু-সন্তদের আহ্বানে বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিতব্য হিন্দু সম্মেলনের কথা জানান এবং সকলকে এই সম্মেলনে যোগদানের আবেদন করেন।

সভায় রাজ্য সমিতির পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক চারটি প্রস্তাব পেশ করেন এবং সেগুলি গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি হলো :

বঙ্গাব্দের প্রবর্তক মহারাজা 'শশাঙ্ক'— এই দাবিকে পশ্চিমবঙ্গের বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হবে।

বঙ্গীয় কীর্তনের ধ্রুপদী স্বীকৃতির জন্য উদ্যোগ নেবে।

গৌড়ীয় নৃত্য বঙ্গের প্রাচীন নৃত্যধারা, তার শাস্ত্রীয় স্বীকৃতির দাবি রাখবে।

কেন্দ্রীয় সরকার নাট্যচর্চার জন্য যে আর্থিক অনুদান দেয়, তা যেন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগঞ্জের ছোটো ছোটো নাট্যদলগুলির কাছে পৌঁছায় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করবে।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদা প্রসাদ পাল বলেন, সংস্কার ভারতী 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'— এই ভারতীয় বিমর্শের ওপর ভিত্তি করে কাজ করছে, তার জন্য কার্যকর্তাদের অহংকারশূন্য হয়ে সংস্কারের মাধ্যমে নিজেদের তৈরি করতে হবে এবং সংগঠনের বিস্তৃতির মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আনতে হবে। জলধর মাহাত তাঁর বক্তব্যে বলেন, সংস্কার ভারতী কোনো শিল্পীগোষ্ঠীর সংগঠন নয়। এই সংগঠন সাংস্কৃতিক জগতের বৈচারিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের দ্বারা সমাজকে সম্পূর্ণভাবে সংগঠিত ও সংস্কারিত করার কাজে নিয়োজিত। যার মাধ্যমে এই সংগঠন শিল্পীদের দ্বারা সমাজকে জাগ্রত করে সমাজে হিন্দুত্বের জাগরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। তার জন্য কার্যকর্তাদের নিজ গুণবত্তার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংগঠনের বিস্তার এবং কার্যক্রমের গুণমান বৃদ্ধি করতে হবে। পরিশেষে সংস্থার সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সংগঠনের বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথা আবার স্মরণ করিয়ে দেন। কল্যাণ মন্ত্রের মাধ্যমে সভা শেষ হয়।

সিউড়ীতে 'শ্রদ্ধা'র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান

আশি বছর বয়স্ক ব্যক্তি, যাঁরা সহস্র পূর্ণ চন্দ্র দর্শন করেছেন, তাঁদের বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আসছে বীরভূমের জেলা সদর সিউড়ীর শ্রদ্ধা সংস্থা। গত ১৮ আগস্ট, শ্রদ্ধা সংস্থার তরফে আয়োজিত ১৫২তম শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান হিসেবে সিউড়ীর বারুইপাড়া নিবাসী স্বর্ণ ব্যবসায়ী ও গায়ক ধীরেন্দ্রনাথ মান্নাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হলো। ওঙ্কার ধ্বনি দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন 'শ্রদ্ধা'র সম্পাদক দামোদর ঘোষাল। প্রদীপ প্রজ্বলন করলেন সিউড়ী ভারত

সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বরদানন্দ মহারাজ। ধীরেন্দ্রনাথবাবুকে পূজা করেন তাঁর বউমা মৌসুমি মান্না। তাঁকে মাল্যদান করলেন 'শ্রদ্ধা'র সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়। তাঁর হাতে উত্তরীয়, বস্ত্র, গীতা, ফল ও মিষ্টান্ন তুলে দেন সমীর মণ্ডল, ইন্দ্রজিৎ দাস, মানব রায়, তপন বাগচী, জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, মিনতি দাস। আরতি করেন কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, সহযোগিতায় সুজাতা বিষ্ণু। মানপত্র পাঠ করেন আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়। 'শ্রদ্ধা'র উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন অধ্যাপিকা চৈতালী মিশ্র। আবৃত্তি করেন পাপিয়া ও প্রিয়াঙ্ক চক্রবর্তী। সংগীত পরিবেশন করেন অসীমা মুখোপাধ্যায়, রূপালি ঘোষাল। অনুভব কথনে ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথবাবুর পুত্র রঞ্জিত মান্না। ৮১ বছর বয়সেও গান করে উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করলেন ধীরেন্দ্রনাথ মান্না। শান্তিমন্ত্র পাঠ করেন সংস্থার সংগঠন সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন শিক্ষক-সাংবাদিক পতিতপাবন বৈরাগ্য।

কলকাতা টালা পার্কে ভয়েস অফ হিন্দুস্থানের আলোচনা সভা

গত ১১ আগস্ট কলকাতায় টালা পার্ক সংলগ্ন মোহিত মৈত্র মঞ্চে সাংস্কৃতিক সংগঠন ভয়েস অফ হিন্দুস্থান এবং একগুচ্ছ জাতীয়তাবাদীদের সমবেত পরিচালনায় আয়োজিত হলো একটি বিশেষ অনুষ্ঠান— 'রক্তাক্ত রাজপথের বিস্মৃত ইতিহাস'। এই অনুষ্ঠানের শুরুতে হয় একটি আলোচনা সভা। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবী নীলাঞ্জন দাম, সৌম্য মজুমদার, সুমন্ত্র মাইতি, রাজা দেবনাথ, নিউ মেক্সিকো ইউনিভার্সিটির অধ্যাপিকা ড. রিণিতা মজুমদার, '১৯৪৬-এর নোয়াখালী' গ্রন্থের লেখক সন্দীপ মুখোপাধ্যায় এবং 'দ্য নিউজ বাংলা' ইউটিউব চ্যানেলের সাংবাদিক মানব গুহ। বাঙ্গালি হিন্দুদের বিগত এক শতকের ইতিহাসের একটি পূর্ণাঙ্গ ক্রম তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে। ঐতিহাসিকভাবে যে ধারাবাহিক হত্যালীলা ও ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়েছে বাঙ্গালি জাতি, তার প্রেক্ষিতে এই মুহূর্তে বাঙ্গালির সার্বিক জাগরণের প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তারা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সভার শুরুতে কৌমোদকী পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যার প্রচ্ছদ উদ্বোধন হয়। সভা শেষের পর আয়োজিত হয় 'সৃজন-দ্য আর্ট অ্যাকাডেমি'-র তরফে একটি নৃত্যানুষ্ঠান। সব শেষে মঞ্চস্থ হয় প্রবীর মণ্ডলের একাঙ্ক নাটক— 'ষোলোই আগস্ট— ১৯৪৬ এবং ২০২৪'। অনুষ্ঠানগুলির সঞ্চালনায় ছিলেন প্রিয়ন্তী রায়, সুমন কুমার দত্ত, দেবারতি দাস, সায়ন দে, ববিতা চক্রবর্তী ভৌমিক ও বিশাল ঘোষ।

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবীর অবদান এবং তাঁর বর্ণময় জীবন

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

বীরত্বের মহিমায় মহিমান্বিত এক মহামানবীর নাম মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবী। ত্রিপুরার রাজ পরিবারের অলংকার এবং ত্রিপুরাবাসীদের জন্য অহংকারও বটে। বহু গুণে গুণান্বিতা ও সাহসী এই মহিলা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গিয়েছেন পার্বত্য ত্রিপুরার হয়ে। ত্রিপুরা আজ বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের একটি অন্যতম রাজ্য। ত্রিপুরাকে ভারতভুক্তির ঐতিহাসিক মহান কাজটি যার চিন্তাপ্রসূত তার নাম মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবী। ইতিহাসে বিস্মৃত হওয়ার আগে সত্য তুলে ধরা ইতিহাস মনস্ক মানুষের কর্তব্য। এই নিবন্ধে বর্তমান ক্ষুদ্র প্রয়াস সেই কর্তব্যের যৎসামান্য প্রয়াস বটে।

১৯৪৭ সালে রাজা বীরবিক্রম কিশোর দেববর্মণের আকস্মিক ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে ত্রিপুরা যেমন অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ে, তেমনই পূর্ব পাকিস্তানের মতো জেহাদি শক্তির হুমকির সম্মুখীন হতে হয়। একই সঙ্গে রাজকর্ম পরিচালনার পেছনে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র প্রশাসনিক সংকটের সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় তৎকালীন কাউন্সিল অব রিজেন্সির সভাপতি হিসেবে রানি কাঞ্চনপ্রভা দেবী বিভিন্ন ভাবে ভারতীয় অধিরাজ্যে যোগদানের পক্ষে প্রবল চাপের সম্মুখীন হন। বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে তিনি ভারত সরকারের পরামর্শ মতো কাউন্সিল অব রিজেন্সি ভেঙে দেন এবং ১৯৪৮ সালের ১২ জানুয়ারি ত্রিপুরার একমাত্র রাজপ্রতিনিধি হয়ে ওঠেন। এক বছরেরও বেশি সময় পর ১৯৪৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তিনি ত্রিপুরার ভারত অন্তর্ভুক্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং এই চুক্তি ওই বছর ১৫ অক্টোবর থেকে কার্যকর হয়। সেদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রিপুরা ভারত অধিরাজ্যের অঙ্গীভূত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ইতিহাসের আরও একটু পেছন ফিরে তাকালে দেখা যাবে এক সুন্দর গল্পের ছায়াবরণে বিশাল সত্যের প্রতিরূপ। ১৯২০-র দশকে এক সুন্দর রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে পোলো খেলা চলছে ক্যালকাটা পোলো ক্লাবে। দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন এক বিশেষ ব্যক্তি যার নাম সিজার দে'ট্রে। সুইস ঘড়ির খুব বড়ো ভক্ত ছিলেন তিনি। এক ব্রিটিশ অফিসার এসে সিজারকে বললেন, 'ঘড়ি পরে খেলতে গিয়ে পোলোর বল লেগে ঘড়ি ভেঙে যেতে পারে। এমন কোনও ঘড়ি আছে যা ভাঙবে না?' এই প্রশ্নের উত্তর তখন সিজারের কাছে ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই এত শক্ত কাঁচ বানানো সম্ভবও নয়। তবে এই সমস্যার কথা শুনে তাঁর মাথায় খেলে যায় একটি নকশার কথা। দেশে ফিরে তিনি য়েগার ডি'কলটা কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং একটি বিশেষ ঘড়ি বানান। এই ঘড়িটির ডায়াল ঘোরানো যেত। খেলার সময় ঘড়িটির ডায়াল ঘুরিয়ে পিছনের দিকে করে দিলে আর কাচ ভাঙার সম্ভাবনা থাকতো না। এই বিশেষ ধরনের ঘড়িটির নাম 'রিভারসো'। বাজারে আসতেই বিপুল জনপ্রিয় হয়ে উঠে এই বিশেষ ঘড়িটি। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষরা এই ঘড়ির ডায়ালের পিছনে আবার

বিশেষ ছবি আঁকিয়ে উপহার দিতেন। 'য়েগার ডি'কলটা' কোম্পানি নিজেদের ঘড়ির মিউজিয়ামের জন্য পুরনো ঘড়ি সংগ্রহ করতো। এই সময় তাদের হাতে আসে একটি ১৯৩২ মডেলের রিভারসো ঘড়ি। এই ঘড়িটির ডায়ালের পিছনে আঁকা ছিল এক সুন্দরী ভারতীয় রাজকুমারীর পোর্ট্রেট। এই রাজকুমারী কে, তা জানতে আনানো হয় যাবতীয় পুরনো অ্যালবাম। অনেক যাচাই বাছাই করে জানা যায় তিনি হলেন ত্রিপুরার মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নীরব সৈনিক। এই স্বাধীনতা সংগ্রামী ত্রিপুরার কঠিন সময়ে শক্ত হাতে রাজ্যের রাশ ধরে একটি গোটা রাজ্যকে বাঁচিয়েছিলেন সে কথা আজও ত্রিপুরাবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হলো। সেই সময় দেশে সাড়ে পাঁচশোর বেশি দেশীয় রাজ্য ছিল। তাদের ভারতভুক্তি করেছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। এরকমই একটি রাজ্য ছিল ত্রিপুরার মাণিক্য রাজবংশ। সেই সময় ত্রিপুরার রাজ সিংহাসনে বসে রয়েছেন মহারাজ বীরবিক্রম কিশোরদেব বর্মণ তিনি ছিলেন বাংলা গানের বিখ্যাত শিল্পী শচীনদেব বর্মণের কাকা। আগে ত্রিপুরার রাজধানী ছিল উদয়পুর। আঠেরো ও উনিশ শতকে পুরাতন আগরতলা নিয়ে ত্রিপুরার এখনকার রাজধানী আগরতলা শহর তৈরি হয়।

ত্রিপুরার রাজা তখন বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের নোয়াখালি ও সিলেট থেকেও খাজনা আদায় করতেন। স্বাধীনতার সময় ভারত-পাকিস্তানের ভাগবাঁটোয়ারা করার জন্য যখন র‍্যাডক্লিফ লাইন টানা হয় তখন টিপেরা, চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকা, নোয়াখালি, সিলেটের মতো হিন্দু আধিক্য অঞ্চলগুলি পাকিস্তানে চলে যায়। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই ভাগবাঁটোয়ারার এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। যার ফলে পরবর্তীতে দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি হয়। সেখান থেকে প্রাণে বাঁচতে অনেক মানুষ পালিয়ে ত্রিপুরায় চলে আসেন।

১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসেই কিশোরদেব বর্মণ বুঝতে পেরেছিলেন, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাবে। ১৯৪৭ সালের ২৮ এপ্রিল মহারাজ সরকারিভাবে ঘোষণা করলেন ত্রিপুরা ভারতের অংশ হবে। সেইমতো ত্রিপুরা বিধানসভার সচিবকে একটি চিঠিও পাঠানো হয়। তবে এই ঘোষণার তিন সপ্তাহের মাথায়, অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ১৭ মে প্রয়াত হন করিৎকর্মা মহারাজা বীরবিক্রম কিশোরদেব বর্মণ। এই আকস্মিক মৃত্যুর ফলে সংকট আরও ঘনীভূত হলো। যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যদেব বর্মণ তখন শিশু। তাই রিজেন্সি কাউন্সিল গঠন করার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং শাসনভার গ্রহণ করেন মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবী। তিনি ছিলেন পান্নার মহারাজের বড়ো কন্যা। ১৯১৪ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩২ সালে, মাত্র ১৭ বছর বয়সে, ২২ বছর বয়সি তরুণ রাজার প্রেমে পড়েন এবং তাঁদের বিবাহ হয়। মহারাজের অকালমৃত্যুর পর গোটা রাজ্যের দায়ভার এসে পড়ে মহারানির উপর। একদিকে ক্রমাগত পাকিস্তানের চাপ, অন্যদিকে রাজ পরিবারের ভেতরেই অন্তর্ঘাত, পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হতে থাকে।

মহারাজের বৈমাত্রেয় ভাই দুর্জয় কিশোর সিংহাসন দখলের জন্য উঠে পড়ে লাগেন। তিনি সেখানকার স্থানীয় মুসলমান নেতা আব্দুল পারেখের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করেন। আবদুল পারেখ ছিলেন আঞ্জুমান-এ-ইসলামিয়া নামক একটি ইসলামি সংগঠনের সভাপতি। মুসলিম লিগের সমর্থনে তাঁরা ত্রিপুরা জুড়ে বিক্ষোভ শুরু করে। তাদের দাবি, ত্রিপুরাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ত্রিপুরা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে দুর্জয় কিশোর হতেন ত্রিপুরার মহারাজা। তাদের এই ষড়যন্ত্র রুখতে উদ্যত হলেন স্বয়ং মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবী। পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন সাহসের সঙ্গে।

১১ জুন, ত্রিপুরা কাউন্সিল বিজ্ঞপ্তি জারি করে মহারানি জানিয়ে দেন, ত্রিপুরা ভারতেরই অংশ হচ্ছে। মহারাজ জীবিতাবস্থায় সেটাই চেয়েছিলেন। এছাড়াও কাউন্সিল সংবিধান সভায় ত্রিপুরার প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করেন মহারানিকে। দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি করতে আবদুল পারেখ ও দুর্জয় কিশোর ত্রিপুরা জুড়ে ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করেন। এই খবর মহারানির কানে যেতেই তিনি বেশ কয়েকটি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর মন্ত্রীসভা থেকে দুর্জয় কিশোরের অনুগামীদের ইস্তফা দিতে বাধ্য করেন। প্রথমে কিছু না করলেও, দুর্জয় কিশোর অচিরেই শুরু করে দেন গুপ্ত হত্যা। দুর্জয় কিশোর রানির অনুগত বেশ কয়েকজন সভাসদকে গোপনে হত্যা করেন। ষড়যন্ত্রকারী দুর্জয় কিশোর ক্ষমতা গ্রহণের জন্য মুসলমানদের নিয়ে বিভিন্ন কলাকৌশল করলেও সেই প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র ভেস্তে যায় মহারানির সুকৌশলী চালে। ভয়াবহ এই পরিস্থিতির আশঙ্কার কথা জানিয়ে মহারানি একটি চিঠি লেখেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে। চিঠি পাওয়া মাত্র অসমের গভর্নরের সঙ্গে বৈঠকে বসেন প্যাটেল। ১৯৪৭-এর অক্টোবর মহারানি, যুবরাজ এবং রাজ পরিবারের কয়েকজন বিশ্বস্ত সদস্যকে শিলঙে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

একই সঙ্গে, ষড়যন্ত্র রুখতে ভারতের বায়ুসেনা পাঠিয়ে দেওয়া হয় ত্রিপুরায়। তীব্র প্রতিরোধের মুখে ষড়যন্ত্রকারীরা পিছু হটে। এরপর ভারত সরকারের পরামর্শে ১২ জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে রিজেন্সি কাউন্সিল ভেঙে দেওয়া হয়। এর দেড় বছর পর অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর, সরকারিভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় ত্রিপুরা। এই সময় সর্দার প্যাটেল নিশ্চিত করেছিলেন যাতে কাশ্মীরের মতো কোনও ঝামেলা ত্রিপুরায় তৈরি না হয়। ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হয় ত্রিপুরা, ১৯৭২ সালে পূর্ণ রাজ্য রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

বর্তমান পার্বত্য ত্রিপুরার সুখ, শান্তি, বিকাশ ও উন্নয়নের পেছনে মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবীর অবদান ঐতিহাসিকভাবে অনস্বীকার্য। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে ত্রিপুরা বিনির্মাণে কাঞ্চনপ্রভা দেবীর বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা এবং ত্রিপুরা প্রীতি ছিল সর্বাধিক। সবই তাঁর গভীর স্বদেশপ্রেমের সুদূরপ্রসারী ফল। □

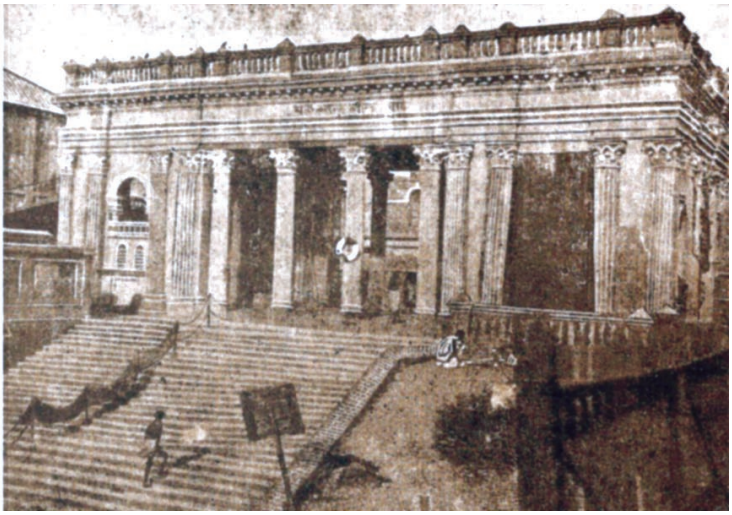

বহু জনহিতকর কাজের জন্য মহাত্মা মতিলাল শীল চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন

দীপক খাঁ

১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে অতি সাধারণ এক ব্যবসায়ী পরিবারে জন্ম মতিলালের। কৈশোরে মাত্র পাঁচ বছরে পিতৃহারা হন। দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় বাবু বীরচাঁদ শীল সেই সময়ে পিতৃহারা বালকের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁরই উৎসাহে ও চেষ্টায় পাঠশালায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। তারপর তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয় কলুটোলার মদন মাস্টারের স্কুলে। এই মদন মাস্টারের স্কুলের পড়াশোনাটাই ছিল মতিলালের জীবনের মাইলফলক। অভিভাবক বীরচাঁদ শীলের উদ্যোগে কিশোর বয়সেই বিয়ে মতিলালের। শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে মতিলালকে তীর্থভ্রমণে যেতে হয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে নানা তীর্থ পর্যটনকালে বহু মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয় তাঁর। ফলে লোকচরিত্র ও লোকব্যবহার সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা লাভ করেন তিনি। ফোর্ট উইলিয়ামে সামরিক অফিসারদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের মধ্য দিয়ে প্রথম অর্থোপার্জন শুরু করেন, সেই সঙ্গে খালি শিশিবোতল ও কর্কের ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে অল্পদিনের মধ্যেই ইউরোপীয় বণিকসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাঁর। সেই সূত্রেই ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্মিথসন সাহেবের বেনিয়ান নিযুক্ত হন। কর্মতৎপরতার গুণে অল্পদিনের মধ্যেই আরও সাত-আটটি ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠীর বেনিয়ানের দায়িত্ব তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। ক্রমে আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় লিপ্ত হন মতিলাল। প্রখর ব্যবসায় বুদ্ধির বলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। অর্থোপার্জনের জন্য কখনও অসৎ পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করেননি। সততাই ছিল তাঁর প্রধান মূলধন। সেই সঙ্গে যুক্ত ছিল ব্যবসায়ীসুলভ ঝুঁকি নেবার সাহস ও বিচক্ষণতা।

১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে হেনরী ডসন অ্যান্ড বেসটেল কোম্পানির অংশীদার মি: ডসন দু'টি জাহাজ নব্বই হাজার টাকা মতিলালের কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে মি: ডসন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হন। শর্ত অনুযায়ী মতিলাল জাহাজ দু'টি ক্রয় করে নেন। ইংরেজ শাসনাধীন ভারতে যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন মি: ডসন। কিন্তু সাহসী মতিলাল মি: ডসনের কোনো কিছুতেই কর্ণপাত করেননি। শেষ পর্যন্ত স্পর্ধিত ইংরেজ বণিক তাঁর কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। সেই সময় ছোটো বড়ো মিলিয়ে মোট তেরোটি জাহাজের মালিক হয়েছিলেন মতিলাল। কলকাতা বন্দরে যে সকল মালবাহী জাহাজ আসত, সেগুলিকে বঙ্গোপাসাগরের মুখ থেকে হুগলি নদীতে নিয়ে আসা এবং পুনরায় সাগরের মুখে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ করার জন্য টাগবোটের প্রচলন তিনিই প্রথম করেছিলেন। তাঁর কর্মকুশলতায় সেকালে ইংরেজরা বিস্মিত হয়েছিল। প্রতিপত্তি ও খ্যাতির দিক থেকে তিনি রুস্তমজী কাওয়াসজী ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমকক্ষ হয়ে ওঠেন। ১৮২০ থেকে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রভূত অর্থবিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি।

সেই যুগের কলকাতা শহরে গড়ে উঠেছিল বাবুসমাজ। নানা উপায়ে হঠাৎ বড়োলোক হওয়া বাবুরা মাহফিল মজলিশের ফুর্তিতে অকাতরে অর্থ অপচয় করতেন। টাকার গরমে নানান হাস্যকর প্রতিযোগিতায় মেতে উঠতেন এই বাবুসমাজ। ব্যাঙের বিয়ে, বিড়ালের বিয়ে, বুলবুলির লড়াই, পায়রা ওড়ানো প্রভৃতি নানা উপলক্ষ্যে অঢেল অর্থ ব্যয় করতেন এই নব্যবাবুরা। সমাজের অপরাপর মানুষদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেবার মতো মানসিকতা তাদের ছিল না। ফলে একদিকে যেমন বাবুসমাজ অর্থের অপচয়ে উন্মত্ত থাকত, অপরদিকে সমাজের সাধারণ মানুষ দারিদ্র ও অশিক্ষার অন্ধকারে হাবুডুবু খেত। এরকম সময়ে দুরবস্থার সুযোগে সাহায্যের অছিলায় খ্রিস্টধর্ম প্রচারে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল খ্রিস্টান মিশনারিরা। এই রকম এক সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্যেই উত্থান ঘটেছিল

মতিলালের। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্তই সাদাসিধে মানুষ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ এক পয়সাও খরচ করতেন না। সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ তিনি অকাতরে ব্যয় করেছেন সমাজের দরিদ্র ও অশিক্ষিত মানুষের কল্যাণে। পশ্চিমের উন্নত জাতিসমূহের সঙ্গে মেলামেশার ফলে মতিলাল উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন দেশের ও সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষার উন্নতি। তাই তিনি সর্বপ্রথম উদ্যোগ নিলেন শিক্ষা প্রসারের কাজে। সেই সময় উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল হাতে গোনা। ওয়ারেন হেস্টিংস প্রতিষ্ঠা করেন একটি মাদ্রাসা। আর এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়ামে চলত দু'টি কলেজ। মতিলাল উদ্যোগী হলেন কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে। হিন্দু কলেজের পরিকল্পনা নিলেন, কলেজ শুরু হলো ফিরিঙ্গি কমল বোসের বাড়িতে। কলেজ চালানোর জন্য সাহায্য করেছিলেন ডেভিড হেয়ার, রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও গঙ্গানারায়ণ দাস প্রমুখ। আর খরচখরচার অধিকাংশ দায়িত্বই বহন করেছিলেন মতিলাল।

১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে মতিলাল নিজের বাড়িতেই শীলস্ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ওই কলেজে একসঙ্গে পাঁচশো ছাত্রের পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়। শীলস্ কলেজে প্রথমে মাইনে নেওয়া হতো ১ টাকা। বিনিময়ে বিনামূল্যে ছাত্রদের দেওয়া হতো বইপত্র, খাতা, পেন্সিল। পরবর্তীতে এখানে পড়াশোনা সম্পূর্ণ অবৈতনিক হয়ে যায়। মতিলালের অর্থে গঠিত ট্রাস্টি ফান্ড থেকেই স্কুল পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব পালিত হতো। শীলস্ কলেজের জন্য তৎকালীন হ্যালিডে স্ট্রিটে একটি প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি তৈরি হয়। প্রসঙ্গত, হ্যালিডে স্ট্রিটের নাম পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ— যার বর্তমানে নাম চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ। শীলস্ কলেজ পরিচালিত হতো সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের তত্ত্বাবধানে। নিজের কলেজে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বজায় রাখার উদ্দেশ্য ছিল মতিলালের। কিন্তু অভিযোগ উঠল, দুপুরে টিফিনের সময় জেসুইট পাদরিরা নিষিদ্ধ মাংস ও বিয়ার মাঝেমধ্যে ছাত্রদের খেতে দেন। তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজে নিষিদ্ধ খাদ্য আহার করলে জাতিচ্যুত হতে হতো। মতিলাল অবিলম্বে এই সমস্যার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করেন। তিনি টিফিনে ছাত্রদের বিনামূল্যে খাবার দেবার ব্যবস্থা করলেন এবং স্কুলে নিয়োগ করলেন সাধারণ ইউরোপীয় ও এশিয়ান শিক্ষকদের। হিন্দু কলেজের আদলেই নানা বিষয়ে এখানে শিক্ষা দেওয়া হতো। অনাথ ও দরিদ্র ছাত্ররা বিনামূল্যে স্কুল বোর্ডিঙে থাকা ও খাওয়ার সুবিধা পেত।

মতিলালের সহযোগিতা ও অর্থ সাহায্যে স্থাপিত হয় হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজের একটি ঘটনায় রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে প্রচণ্ড বিক্ষোভ হয়। ঘটনা হলো, হীরা বুলবুল নামে এক বারবণিতার ছেলেকে ভর্তি করা হয়েছিল হিন্দু কলেজে। ফলে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় অভিভাবকদের মধ্যে। কলেজ পরিচালনা সমিতির অভিজাত হিন্দু সদস্যরা পদত্যাগ করেন। তাঁরা নিজেদের পরিবারের ছেলেদের কলেজ ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন। তাঁদের দেখাদেখি অন্যান্য অনেক ছাত্রই সরে পড়ল। তবুও হাল ছাড়েননি তিনি। এখানে দরিদ্র ছাত্রদের পড়াশুনার যাবতীয় ব্যয় বহন করতেন মতিলাল। সেই সময়ের কলকাতা একটি বড়ো গ্রামের চাইতে খুব একটা বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর ছিল না।

ঝোপজঙ্গল চারদিকে, ছিল খানাখন্দ, ডোবা। সেই সঙ্গে শহর ঘিরে কাঁচা নর্দমা। মশা ও মাছির উৎপাত নাগরিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল বলা চলে। ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া আর পেটের রোগ। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে অকালে বহুলোক প্রাণ হারাত।

চিকিৎসা ব্যবস্থার এই বেহাল অবস্থা দূর করার লক্ষ্য নিয়ে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হলো মেডিক্যাল কলেজ। এখানে জ্বরজারির চিকিৎসার জন্য খোলা হয়েছিল কুড়ি বেডের ফিভার হসপিটাল। ফিভার হসপিটাল খোলার জন্য মতিলাল শীলের অবদান ছিল বিপুল। বারো হাজার টাকা মূল্যের বিশাল জমি দিয়েছিলেন তিনি। দান করেছিলেন নগদ একলক্ষ টাকা। দেশীয় তরুণরা যাতে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ার ব্যাপারে উৎসাহিত হয় সেজন্য তিনি ছাত্রদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর অর্থ সাহায্যে প্রসূতিদের জন্য এই সময় একটি আলাদা হাসপাতাল খোলা হয়।

বিখ্যাত সমাচার দর্পণ পত্রিকা ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ২২ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় লিখেছিল— 'জমিদারেরা তাদের পিতৃশ্রাদ্ধাদি ও বিবাহাদি উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে থাকেন। আর সাধারণ লোকের দুরবস্থার দিকে তাঁদের নজর পড়ে না। সেক্ষেত্রে মতিলাল শীলের মাহাত্ম্য এই প্রতিকার মারফত জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রকাশ পাইবার যোগ্য হইয়াছে।' ব্যক্তিগত জীবনে মতিলাল ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। কিন্তু ধর্মের গোঁড়ামি তাঁর ছিল না। ধর্মের নামে বাহ্যিক আড়ম্বর তিনি পছন্দ করতেন না। অযথা অপব্যয় হিসেবে দেখতেন। তাঁর কাছে দেশহিতৈষণা ও লোকসেবাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হতো। দেশের নিরন্ন, দরিদ্র, দুঃখী মানুষের জন্য মতিলাল নিজে বেলঘরিয়া অঞ্চলে একটি অতিথিশালা তৈরি করে দিয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে দেশের ধনবান মানুষেরা যাতে দারিদ্রের দুঃখ দূর করার জন্য কাজে সচেষ্ট হন, সেজন্য তাঁদের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছিলেন— 'জমিদারদের বলি, নিজেদের উপার্জনের সবকিছু ব্যয় না করে কিছু গাভী একটি ও একজোড়া বলদ ক্রয় করে এদের সাহায্যে ব্যয় করেন, তাহলে অন্তত কিছু চাষি খেয়ে পরে বাঁচতে পারে।'

ধর্মীয় ব্যাপারে যারা নানা আড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অর্থ ব্যয় করেন তাঁদের ধর্মের মূলকথাগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়ে একবার তিনি বলেছিলেন, 'দান বদান্যতা সমস্ত দেশ, সমস্ত ধর্ম, সমস্ত জাতির মধ্যেই ধর্মমূলক প্রধান কৃত্যরূপে স্বীকৃত হয়েছে। আপনারা একবার আমাদের দেশের শত শত নিরন্ন ও বস্ত্রহীন লোকেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। দরিদ্রের দারিদ্রমোচন, অন্নহীনকে অন্নদান, অশিক্ষিত মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যকর্ম। এই পবিত্র ধর্ম হইতে আমরা দূরে সরিয়া আছি। এইগুলির অনুষ্ঠানেই ধর্মসভার মুখ উজ্জ্বল হইবে।' দানবীর মতিলাল অনাথ ও বিধবাদের জন্য একটি স্থায়ী ধনভাণ্ডার গঠন করেন।

স্নানার্থীর জন্য গঙ্গায় ঘাট নির্মাণ তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য কীর্তি। বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত হিন্দু বিধবা বিবাহ আন্দোলনেরও সক্রিয় সমর্থক ছিলেন মতিলাল। জীবদ্দশায় বহু ধন তিনি উপার্জন করেছেন এবং জনকল্যাণকর কাজে সেই অর্থ অকাতরে ব্যয় করেছেন। তাঁর এই ধারা তাঁর বংশধরদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। মতিলালের পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন হীরালাল শীল। দানশীলতার জন্য তিনি দেশজোড়া খ্যাতি লাভ করেছিলেন। দেশে অকাল ও দুর্ভিক্ষের সময় তিনি অন্নসত্র খুলে লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মানুষকে ক্ষুধার অন্নদান করেছেন। প্রতিদিন তিন হাজার মানুষ সেখানে খেতে পেত। ১৮৫৪ সালে মাত্র ৬৩ বছর বয়সে খ্যাতকীর্তি মতিলাল শীলের জীবনাবসান হয়। □

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল সমস্যা এবং সমাধানের পথ

বাপী প্রামাণিক

ভারতে যে সমস্ত রাজ্য আছে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারের সঙ্গতি বিধান কখনোই দৃষ্টিগোচর হয় না। পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ শিক্ষক সংগঠন শুধুমাত্র শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অধিকারের কথাই বলে, শিক্ষা ব্যবস্থার বা শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা কখনোই বলে না। প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষকদের প্রতি সমাজ শ্রদ্ধাশীল। আদর্শ শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্মান সমাজে এখনো আছে, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং ভবিষ্যতে সেই সম্মান ও মর্যাদা কতটা ধরে রাখা সম্ভব, সেই সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

শিক্ষা ব্যবস্থার মূল কাণ্ডারি শিক্ষক সমাজ, এটা আমাদের অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষকরা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দলীয় রাজনীতি ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণেই শিক্ষা ব্যবস্থার মূল সিদ্ধান্তের জায়গা থেকে অনেক সরে গেছেন। শিক্ষকতা বর্তমানে পেশা হয়ে গেছে, ব্রত আর নেই। যদিও শিক্ষকদের এই চিন্তাভাবনার বর্তমান অবস্থা হঠাৎ করে চলে আসেনি। এই রাজ্যের শ্রমিক, কর্মচারীদের মতো শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠনের মূল কর্মপদ্ধতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, আন্দোলনের স্বরূপ, দাবি-দাওয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাঁরা নিজেদের পেশাগত দাবির বাইরে একটি কথাও বলেছেন না। শিক্ষা ব্যবস্থাকে কীভাবে পরিচালনা করা দরকার, শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত, পঠনপাঠন ও সিলেবাস কী রকম হওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বেশিরভাগ শিক্ষক সংগঠনের কোনো মাথাব্যথা নেই। এই সকল কারণে বর্তমানে এই রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার এক কলঙ্কিত অধ্যায় সামনে এসেছে। সমাজ আর শিক্ষকদের সমীহ করছে না। শিক্ষকরাও সমাজ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সামাজিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মধ্যে যে সুমধুর সম্পর্ক ছিল তা বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভারতের সকল রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই এইরকম সমস্যা ভীষণভাবে প্রকট হয়েছে। যে বঙ্গ আগে মহান শিক্ষাগুরুদের পীঠস্থান ছিল, তার এরকম হতদরিদ্র অবস্থা কেন এর পর্যালোচনা করা ভীষণভাবে দরকার।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে তিনটি সমস্যা ভীষণভাবে চোখে পড়ছে। প্রথম সমস্যা, কেন্দ্রীয় নির্দেশের বিরোধিতা। আজকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের পেশাগত যত সমস্যা, প্রত্যেকটা সমস্যার প্রধান কারণ, স্বাধীনতার পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার যা যা নির্দেশ দিয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার সম্পূর্ণ উলটো পথে হেঁটেছে। তার ফল আজকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের ভুগতে হচ্ছে। শিক্ষা যেহেতু যৌথ তালিকার অন্তর্গত, সেই কারণে রাজ্য সরকার বলছে কেন্দ্র যা বলছে তারা তা মানবে না। অর্থাৎ যৌথ মানে আমি আমার মতো চলবো। এর ফলে এনসিইআরটির যে নির্দেশ প্রশিক্ষণ বিহীন চাকুরি প্রার্থীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছিল। এর ফলে সেই সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাধিক ইনক্রিমেন্ট লোকসান করতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেই একমাত্র পাশ গ্র্যাজুয়েট, অনার্স গ্র্যাজুয়েট এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট— এই তিন ধরনের স্কেল চালু আছে যা এনসিইআরটি-র নীতিবিরুদ্ধ। এর ফলে বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টিজিটি স্কেলের জন্য যে আন্দোলন, যা কেন্দ্র আগেই বলেছিল। কারণ ভারতের প্রত্যেকটা রাজ্যেই টিজিটি এবং পিজিটি এই দুটো স্কেলই শুধুমাত্র চালু আছে। একইরকমভাবে প্রাথমিক শিক্ষকদেরও বিভিন্ন রকমের সমস্যা আছে। তার মধ্যে ৫০ শতাংশ নাম্বার ছাড়া শিক্ষক, ডিএলএড ছাড়া শিক্ষক ওডিএল মোডে পুনরায় প্রশিক্ষণ নেওয়া, এক বছরের জায়গায় দু'বছরের প্রশিক্ষণ নিয়েও পাশ না করা, দেরিতে রেজাল্ট এই সমস্ত বিভিন্ন রকমের পেশাগত সমস্যা যেগুলো পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তার ফল ভুগতে হচ্ছে শিক্ষকদেরই।

এখনোও রাজ্য সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ নিয়ে পুনরায় ভুল করছে। এই জাতীয় শিক্ষানীতি যত দ্রুত প্রণয়ন হবে, ততই পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রত্যেকের মঙ্গল। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি জাতীয়তাবাদী শিক্ষক সংগঠন এবিআরএসএম ছাড়া সমস্ত শিক্ষক সংগঠনই জাতীয় শিক্ষানীতির

ফঃ ৫

বিরোধিতা করছে। যা একদমই কাম্য নয়। জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সেমিস্টার পদ্ধতি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের মর্জিমতো জাতীয় শিক্ষানীতির বিকল্প হিসেবে 'বাংলা শিক্ষানীতি' চালু করতে চাইছে। সেখানে বলা হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষাও হবে, আবার উচ্চ মাধ্যমিকে সেমিস্টার পদ্ধতিও হবে। এটা কখনোই হতে পারে না, এর ফল আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের ভুগতে হবে। শুধুমাত্র তারাই ভুগবে না, এর ফল শিক্ষকদেরও ভুগতে হবে। সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজকে এজন্য ক্ষতির শিকার হতে হবে। কারণ এই জাতীয় শিক্ষানীতিতে— শিক্ষক কেমন হবেন, শিক্ষক নিয়োগ কীভাবে হবে, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কী রকম হবে, সমস্ত কিছু খুঁটিনাটি বিষয় সুন্দরভাবে বলা আছে। শিক্ষকদের সম্পর্কে একটা অধ্যায়ই আছে জাতীয় শিক্ষানীতিতে। তাতে খুঁটিনাটি বিষয় সুন্দরভাবে বলা আছে। কিন্তু বেশিরভাগ শিক্ষক সংগঠনই এই জাতীয় শিক্ষানীতিকে গৈরিকীকরণ শিক্ষা নাম দিয়ে এই শিক্ষানীতির বিরোধিতা করছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থায় দ্বিতীয় সমস্যা হলো সাম্প্রদায়িক তোষণ। এই সাম্প্রদায়িক তোষণের পিছনে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিলেবাসে ইসলামীকরণ। যার ফলস্বরূপ পাঠ্যপুস্তকে রামধনুকে রংধনু, আকাশিকে আসমানি, মাকে আম্মা , বাবাকে আব্বা ইত্যাদি লেখা কীসের ইঙ্গিত বহন করছে? মাদ্রাসাগুলোতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বাধা, জাতীয় সংগীত গাওয়া হলে সেই মাদ্রাসা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া বহিরাগত দুষ্কৃতীদের দ্বারা, সাধারণ শিক্ষার তুলনায় মাদ্রাসা শিক্ষায় বেশি পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করা, স্কুলগুলোতে সরস্বতী পূজা বন্ধ করে নবি দিবস পালন করা, ঐক্যশ্রীর নামে মুসলমান শিক্ষার্থীদের সরকারি অর্থ পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা— এসবই করা হচ্ছে ৩০ শতাংশ ভোটব্যাংককে সামনে রেখে। সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন থেকে শুরু করে সমস্ত শিক্ষক সংগঠন তোষণের নামে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি করে চলেছে। এবিআরএসএম-ই একমাত্র বিকল্প সংগঠন যে এসবের বিপক্ষে কথা বলে। বাকি সবাই ধর্মের নামে রাজনীতি করে, আবার তাঁরাই হচ্ছেন সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ। যা ভাবলে সত্যিই অবাক লাগে। ২০২২ সালের টেস্ট পেপারের 'আজাদ কাশ্মীরে'র উপরে যে বিতর্কিত প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে এবিআরএসএম-ই একমাত্র প্রতিবাদ করেছিল। ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশনের নিকট আমরা ডেপুটেশন দিয়েছিলাম। তার ফলস্বরূপ ২০২৩ সালে টেস্টের প্রশ্ন করার সময় যাতে সচেতন ভাবে প্রশ্ন করা হয় বা, বিতর্কিত প্রশ্ন না করা হয় সেই ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে। এখানেই আমাদের সংগঠনের গুরুত্ব বা সফলতা। আমাদের সংগঠন সংখ্যায় ছোটো হতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক বড়ো বা মহৎ। ধর্মের নামে যে রাজনীতি চলছে, সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে না এলে, না হবে পশ্চিমবঙ্গের মুক্তি, না হবে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার মুক্তি।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে তৃতীয় সমস্যা হলো, শিক্ষায় রাজনীতিকরণ। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের বেশিরভাগই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চান। তাঁরা সেই দলের এমপি বা এমএলএ-র সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলতে চান। শুধু তাই নয়, সেই দলের যদি অনেক গ্রুপ থাকে, তাহলে যে গ্রুপটি শক্তিশালী সেই গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত থাকার চেষ্টা করেন, বিভিন্ন রকমের অনৈতিক সুবিধা পাওয়ার জন্য। ডিপিএসসি চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য বা বোর্ড সভাপতি হওয়ার জন্য রাজনৈতিক কার্যকর্তাদের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করেন অনেক শিক্ষক, শিক্ষিকা। যা বামপন্থী আমল থেকে চলে আসছে। অথচ সরকার স্কুলের টিচাররা নির্বাচনে দাঁড়াতে পারেন না।

সেই ভাবে যদি আমাদের মতো এইডেড থেকে স্পন্সরড হওয়া স্কুলগুলো যখন পুরোপুরি সরকারি স্কুল হবে, তখন এই শিক্ষকরা প্রকৃত শিক্ষক হয়ে উঠবেন। কারণ রাজনীতি করতে গেলে তাঁদের চাকরি ছেড়েই রাজনীতিটা করতে হবে। তা না হলে, না হবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ভালো, না হবে শিক্ষা ক্ষেত্রের ভালো। যখন পুরোপুরি সরকারি স্কুল হবে, পশ্চিমবঙ্গেও তখন শিক্ষকরা পড়াশোনা, সিলেবাস নিয়ে চিন্তা করবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো করে পড়াবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসরুমের ব্যাপারে যোজনা করবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে করে একটু খোলামেলা পরিবেশে পড়াশোনা করতে পারে তার জন্য চিন্তাভাবনা করবেন।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থা এতটাই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল যে তার ফলে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক সুমধুর ছিল। অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান সময়ের মতো এত অর্থ বরাদ্দও ছিল না। আগে বঙ্গ যে দিশা দেখাতো, ভারতবর্ষ সেই দিশা অভিমুখে চলতো। আজ পশ্চিমবঙ্গ সব রাজ্যের থেকে পিছিয়ে। এই রাজ্যের মানুষ জানেন, শিক্ষকরা ডিএ-র জন্য স্কুলে না পড়িয়ে ধরনা মঞ্চে অবস্থান করেন, শিক্ষকরা ফাঁকিবাজি করেন, মিড-ডে মিলের টাকা চুরি করেন, চাকরি বিক্রি করেন। এইসব কথা ছাত্রসমাজের মাথায় ঢুকে গেছে। যার জন্য শিক্ষক হিতে সমাজ আর নেই। শিক্ষকরা বেতন কম পেলেও, শিক্ষকরা ডিএ না পেলেও, সমাজ কিন্তু পাশে থাকবে না। অথচ সমস্ত সংগঠন শিক্ষক সমাজকে বিপথে পরিচালিত করছে। ধর্মঘট, ধরনা মঞ্চ ইত্যাদির নামে ফাঁকিবাজিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে।

সমাজের মধ্যে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে, শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানকে ফিরিয়ে আনতে, আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে 'কর্তব্যবোধ দিবস' ও 'গুরুবন্দন কার্যক্রমে'র আয়োজন করা হয়। শিক্ষকদের সম্পর্কে সমাজের মধ্যে নতুন করে শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করতে পারলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে দলীয় রাজনীতির বাইরে বের করে আনতে পারলে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার পুরো দায়িত্ব শিক্ষকদের উপর ন্যস্ত করতে পারলে, আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা সঠিক পথে পরিচালিত হবে। 'রাষ্ট্র হিতে শিক্ষা, শিক্ষা হিতে শিক্ষক এবং শিক্ষক হিতে সমাজ'— এই মন্ত্রের দ্বারা একমাত্র এবিআরএসএম নামক বিকল্প সংগঠনই পারে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে এবং শিক্ষকদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে। তবেই ভারত পুনরায় জগদ্‌গুরুর আসন লাভ করবে। সেই কারণেই জাতীয়তাবাদী শিক্ষক সংগঠন 'অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ' বা এবিআরএসএম জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের নিকট যেমনভাবে গ্রহণযোগ্য, ঠিক তেমনভাবেই সমাজের সকল স্তরের জাতীয়তাবাদী মানসিকতা সম্পন্ন মানুষের নিকটও সাদরে গ্রহণীয়।

(লেখক সাধারণ সম্পাদক, অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ (স্কুল শিক্ষা), পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সমিতি)

মহালয়ার আগেই দেবীপক্ষের সূচনা

শুধুমাত্র ইতিহাস নয় শাস্ত্র হিসেব করলেও মহালয়ার ৫০ দিন আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দেবীপক্ষের সূচনা হলো। শুধুমাত্র প্রতিবাদকে সামনে রেখে অসুর নিধনের উদ্দেশ্যে বঙ্গের সমস্ত নারী শক্তি ১৪ আগস্ট রাত্রি ১১-৫৫ মিনিটে যে অসুর নিধনে এগিয়ে এলেন তারা তাদের অজান্তেই পশ্চিবঙ্গের মাটিতে দেবীপক্ষের সূচনা করলেন। মাতৃশক্তির পূজারি হিসেবে মাতৃশক্তি এই আহ্বানকে নতমস্তকে প্রণাম জানাচ্ছি। এরাজ্যের মাটি থেকে, দেশের মাটি থেকে, পৃথিবীর মাটি থেকে সমস্ত অসুর বিনাশ আমরা কামনা করি। অরাজনৈতিক ভাবে এত মানুষ শুধুমাত্র নারীশক্তির সুরক্ষার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে পৃথিবীর সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসে এটি একটি নতুন অধ্যায় হিসেবেই চিহ্নিত থাকলো। আগামীদিনে সমাজ বিজ্ঞানীদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় হয়ে থাকলো মহালয়ার ৫০ দিন আগেই দেবীপক্ষের এই শুভ সুচনা। সমস্ত মাতৃশক্তির সুরক্ষা এবং নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দেবার দায়িত্ব দায়িত্বশীল সরকারের। আশা রাখি কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যের রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলের যৌথ উদ্যোগে দেশের মাতৃশক্তি সুরক্ষিত থাকবে, ক্ষমতাবান হবে দেশের নারী শক্তি।

অপরাধীর দ্রুত শাস্তির দাবিতে যে দেবীপক্ষের সূচনা হলো, সেই দেবীশক্তিকে নতমস্তকে প্রণাম, অভিনন্দন। তাকে সার্বিকভাবে প্রত্যক্ষ সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত এ রাজ্যের মানুষ, এদেশের মানুষ।

—কুন্তল চক্রবর্তী,
কলেজরোড খয়রামারী, বনগাঁ উ: ২৪ পরগনা।

মলয়-মালয়-মালয়েশিয়া

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ মালয়েশিয়া। এই দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে রেখেছে দক্ষিণ চীন সাগর। পশ্চিম ভূখণ্ড অবস্থান করছে মালয় উপদ্বীপে এবং পূর্ব ভূখণ্ড অবস্থান করছে বোর্নিও দ্বীপে। মালয়েশিয়ার আয়তন প্রায় ৩ লক্ষ ৩০ হাজার বর্গকিলোমিটার। এখানবার সরকারি ভাষায় নাম মালয়। দেশ ৬০ শতাংশ অরণ্যাবৃত। এই সব বনে বাঁশ, কর্পূর, চন্দন, সেগুন, পাম গাছ জন্মায়।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, দুই হাজার বছর আগে অর্থাৎ প্রথম শতাব্দীতে এদেশে ভারত আর চীন দেশের ব্যবসায়ীদের আগমন ঘটে। এর ফলে তাদের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে। যেমন এই দেশের নামে ভারতীয় প্রভাব পড়েছে। ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি, এদেশে কর্পূর ও চন্দনকাঠ বনে জন্মাত। কর্পূর ও চন্দনে বাতাস সুগন্ধিময় হয়ে প্রবাহিত হতো যা সকলকে আকর্ষণ করত। সুগন্ধিময় বাতাসকে সংস্কৃত ভাষায় মলয় বলে। এই মলয় থেকে ভূখণ্ড ও ভাষার নাম হয় মালয়। প্রসঙ্গত, কেরালা রাজ্যের উপরাংশে অবস্থিত মালাবার অঞ্চলের কথা বলতে হয়। এই অঞ্চলে চন্দন কাঠ জন্মাবার জন্য বাতাস সুগন্ধিময় হয়ে থাকত। তাই মলয় শব্দের অনুকরণে অঞ্চলের নাম হয় মলয়+আলয়ম= মালয়ালাম। পরে ভাষার নামও হয় মালয়ালাম। মালয়ালাম নামের বিবর্তিত নাম মালাবার। পরবর্তীতে দেশবাচক 'নেশিয়া' বা 'শিয়া' যুক্ত হয়ে মালয় হয়েছে মালয়েশিয়া।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ।

বিচার চাই

সম্প্রতি আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের উপর নারকীয় ও নৃশংস ঘটনা গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছে। একটি মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে অতি কষ্টে বড়ো হয়ে ডাক্তার হয়েছিলেন তিনি। কলকাতার মতো শহরের হাসপাতালে রাতের বেলা নিজের ডিউটি পালন করছিলেন। একদল নরপশু তাঁকে ধর্ষণ করে নৃশংস ভাবে খুন করে। শুধু তাই নয়, সত্যকে চাপা দেওয়ার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নানারকম অপচেষ্টা চালিয়ে যায়। সবচেয়ে সন্দেহের বিষয়, প্রথমে তারা এই ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে চালাতে চেয়েছিলেন কিন্তু মেয়েটির বাবা-মা সবরকম ভয় হুমকি উপেক্ষা করে তাদের মেয়ের নৃশংস খুনের বিচার চান। পশ্চিমবঙ্গে ধর্ষণ দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে তার অন্যতম কারণ হলো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এতদিন ধর্ষণকে ছোটো ঘটনা, সাজানো ঘটনা, লাভ কেস বলে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই ছোট্ট ঘটনা আজ বৃহৎ আকার ধারণ করেছে। কিছুদিন আগে কামদুনির অভিযুক্তরা তথ্য প্রমাণের অভাবে উচ্চ আদালতে তাদের শাস্তি কমে যায় ফলে জামিন পায়। বিগত দিনের পশ্চিমবঙ্গে ঘটে যাওয়া ধর্ষণের ঘটনাগুলোতে সেইরকম দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়নি বরং পুলিশ প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে দোষীরা জামিন পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই মেয়েটির উপর পাশবিক অত্যাচার ও নৃশংস খুনের ঘটনায় পুলিশ ও প্রশাসন প্রথম থেকেই একজনকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ঘটনার চিত্রনাট্য পালটে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

আদালতের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত চলছে কিন্তু আসল দোষীদের নাগাল কতটুকু পাবে তা প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ প্রমাণ নষ্টের জন্য সবরকম চেষ্টা করা হয়েছে। সত্যকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা ও সমান অপরাধ, তাই যারা এই ঘটনা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তাদের ও শাস্তির ব্যবস্থা করুক। যে পুলিশ ও প্রশাসনের উপর মানুষ ভরসা করে, সেই পুলিশ দুষ্কৃতীদের ভয়ে লুকিয়ে পড়ছেন। রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নারীদের উপর অত্যাচার বন্ধ করতে পারছেন না। তাই সুবিচারের আশায় সবাই রাস্তায় নেমেছেন একটাই দাবি, বিচার চাই।

—চিত্তরঞ্জন মান্না,
চন্দ্রকোনারোড, পশ্চিম মেদিনীপুর।

কর্তা বড়ো না সমর্থক বড়ো

নিলয় সামন্ত

শোনা যায় ১৯৪২ সালে ৯ আগস্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে বাগবাজারের দুই প্রান্ত থেকে যথাক্রমে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ক্লাবের কর্মকর্তা ও সমর্থক-সহ এক পদযাত্রা শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় থেকে হেদুয়া পর্যন্ত আসে। হতে পারে তারা মোহনবাগানে সমর্থক, হতে পারে তারা ইস্টবেঙ্গল সমর্থক। কিন্তু তারা ছিল ভারতীয়। ভারত থেকে ইংরেজ তাড়াতে চেয়েছিল।

এবারে ২০২৪ সালের ১৮ আগস্ট আবার মোহনবাগান- ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল। এবার কাউকে তাড়াতে নয়, সঠিক বিচার চেয়ে তারা আন্দোলনে নেমেছিল। এই আন্দোলন এতটাই স্বতঃস্ফূর্ত ছিল যে সল্টলেক স্টেডিয়ামের তিনদিকের রাস্তায় মানুষে মানুষে ভরে গিয়েছিল। সেই মানুষের মধ্যে ছিল বালক- বালিকা, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, মধ্যবয়স্ক-মধ্যবয়স্কা এমনকী প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া পর্যন্ত।

সব থেকে মজার ব্যাপার ওইদিন ওই দুই ক্লাবের মধ্যে সামরিকবাহিনী পরিচালিত ডুরান্ড কাপের গ্রুপ লিগের খেলা ছিল। পুলিশি নিরাপত্তার অভাবে ম্যাচটা বাতিল হয়ে যায়। পুলিশি নিরাপত্তার অভাব, কারণ পুলিশ অন্য কাজে নাকি ব্যস্ত ছিল, তাই খেলার দর্শকদের নিরাপত্তা দেওয়ার সামর্থ্য তাদের ছিলো না। কিন্তু দর্শক যখন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো তখন দলে দলে পুলিশ সেখানে এসে উপস্থিত হলো। তারা লাঠির আঘাতে ফুটবল সমর্থকদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করতে লাগল। দিনের শুরুতে ছয় সমর্থককে গ্রেপ্তার করেও তাদের নিয়ে যেতে পারেনি সমর্থকদের বাধায়। পরে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবের হস্তক্ষেপে সেই সমর্থকরা মুক্তি পায়।

তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই আন্দোলনে মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের কোনো কর্মকর্তাকে দেখা যায়নি। দেখা যায়নি রাজ্য ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের অন্য কোনো কর্তাকেও। কিন্তু এসেছিলেন ফুটবলাররা। সংখ্যায় হয়তো তাঁরা হাতে গোনা, তবুও তাদের প্রতিনিধি তো ছিল। এরপর কলকাতা ফুটবল লিগের খেলায় ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা কুড়ি তারিখের ম্যাচে ক্লাব যখন রেনবোর বিরুদ্ধে খেলছে, তখন বড়ো বড়ো ব্যানারের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল। গোল করার পর খেলোয়াড়রা জার্সি তুলে নীচের জার্সিতে যে প্রতিবাদ সংকেত দেওয়া ছিল, তা দেখাচ্ছিল । অথচ তাদের এক সহ খেলোয়াড়কে ১৮ তারিখ প্রতিবাদে অংশ নেওয়ায় কৈফিয়ত তলব করা হয়েছিল।

কর্মকর্তারা যখন বুঝলেন সব হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, ঠিক তখনই ২০ আগস্ট কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে তারা যৌথভাবে অর্থাৎ মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের শীর্ষকর্তারা এক সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন। সবাই ভেবেছিলেন কর্তাদের মধ্যে বোধহয় বোধোদয় হয়েছে, তারাও এবার প্রতিবাদে নামতে চলেছেন।

কিন্তু ওই সাংবাদিক সম্মেলনে দেখা গেল তারা যৌথভাবে এসেছিলেন, নাকি রাজ্যের ফুটবল ফিরিয়ে আনতে। ডুরান্ড কাপের অন্তত সেমিফাইনাল আর ফাইনাল যাতে পশ্চিমবঙ্গে হয়, তার নাকি তারা উদ্যোগ নিয়েছেন। ১৮ আগস্টের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ডুরান্ড কমিটি ডার্বি ম্যাচ বাতিল করে দেয়। আর মোহনবাগানকে জামশেদপুরে ও ইস্টবেঙ্গলকে শিলঙে খেলতে আহ্বান করে। তাই নাকি তিন প্রধানের কর্তারা সেনাবাহিনীর সঙ্গে কথা বলে রাজ্যের ফুটবল ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন।

ঘরভর্তি সাংবাদিকদের মধ্যে থেকে যখন বর্তমান পরিস্থিতির ওপর প্রশ্ন শুরু করা হয়, সমর্থকরা প্রতিবাদ সভায় নামলেও কর্তারা কেন সেই পথে পা বাড়ানানি, তাই নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, তখন ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার মাইক বন্ধ করে সাংবাদিক সম্মেলন বন্ধ করে দেন। সমাজমাধ্যমে এরপরেই কর্তাদের মেরুদণ্ডের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে ঝাঁপিয়ে পরেন সমর্থকরা। □

দূষণহীন বোট তৈরি করে জলপথ পরিবহণের ক্ষেত্রে বড়ো আবিষ্কার সিএমইআরআই-এর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বড়ো মাপের একটি আবিষ্কার! বোট চলবে, কিন্তু দূষণ হবে না। দূষণমুক্ত জলপথ পরিবহণের লক্ষ্যে গৃহীত একটি গবেষণা প্রকল্প সম্প্রতি বাস্তবে রূপায়িত হলো।

দুর্গাপুরের সেন্ট্রাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা সিএমইআরআই-এর বিজ্ঞানী ও গবেষকদের হাত ধরে জলপথ পরিবহণের ক্ষেত্রে আগামী দিনে আসতে চলেছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বর্তমানে জলপথে ডিজেল-চালিত বোটগুলি ব্যাপক হারে বায়ুদূষণের জন্য দায়ী। ডিজেল-চালিত বোটগুলির পরিবর্তে এই বোটের ব্যবহার কমাবে বায়ুদূষণ।

সম্প্রতি সিএমইআরআই, দুর্গাপুর তৈরি করে ফেলেছে সোলার পাওয়ার বা সৌরবিদ্যুৎ-চালিত এক ধরনের ইলেকট্রিক বোট, যা জলপথ পরিবহণকে দূষণমুক্ত করার পক্ষে সহায়ক হবে। ইতিমধ্যেই সিএমই আরআই নির্মিত এই পরিবেশবান্ধব জলযানের কার্যকারিতা সফলভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। সৌরবিদ্যুৎ-চালিত এই ইলেকট্রিক বোটে বসতে পারবেন ১৬ জন সাধারণ যাত্রী। তাছাড়াও দু'জন ক্রু-মেম্বারের জায়গা রয়েছে এই বোটে।

ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা সিএমইআরআই-এর তরফে জানানো হয়েছে যে, এই বোট নির্মাণের বিষয়টি তাদের রিনিউয়েবল্ এনার্জি (আর.ই.) প্রোজেক্টের অন্তর্গত। এই বোটটি হলো আর.ই.-এমপাওয়ার্ড, অর্থাৎ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিচালিত। তাদের নির্মিত এই সোলার-ইলেকট্রিক বোটটি 'টুইন হাল ক্যাটামারান'-গোত্রের একটি বোট যা সম্পূর্ণরূপে সাস্টেনেবল্ (সুষম উপায়-বিশিষ্ট) ও ইকো-ফ্রেন্ডলি (পরিবেশবান্ধব) জলপথ পরিবহণের একটি উপযুক্ত মাধ্যম। জ্বালানি তেল ব্যবহারের পরিবর্তে সৌরবিদ্যুৎ দ্বারা চালিত হওয়ায় এই বোট পরিবেশ দূষণের মাত্রা অনেক কমাবে।

দুর্গাপুর সিএমইআরআই-এর বিজ্ঞানী ও গবেষকদের আবিষ্কৃত এই বোটকে বেশ গুরুত্ব দিয়েই বিচার করছে বিশেষজ্ঞ মহল। বর্তমানে যখন ব্যাটারি-চালিত বাইক (ইলেকট্রিক বাইক) ও অন্যান্য গাড়ির চাহিদা বাড়ছে, সেই সময় দাঁড়িয়ে সৌরবিদ্যুৎ-চালিত এই বোট জলপথ পরিবহণে যথেষ্ট কার্যকরী হবে বলেই গবেষকরা মনে করছেন।

সিএমই আরআই-এর বিজ্ঞানীদের এই গবেষণা ও তার সফল বাস্তবায়ন— ভারতীয় উদ্ভাবনীশক্তি ও প্রযুক্তির পরিচায়ক, পরিবেশবান্ধব যানবাহন নির্মাণে আগামী দিনে যা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবে। এই প্রজন্মের বহু গবেষককে এই সংক্রান্ত গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করবে। □

কৃষ্ণজননী—দেবকী

পুরাকালে ঋষি কশ্যপ বরুণদেবের কামধেনু অপহরণ করে তা প্রত্যর্পণে কিছুতেই রাজি হননি। তাই বরুণদেব অভিশাপ দিলেন, কশ্যপ এবং তাঁর স্ত্রী অদিতি জন্মান্তরে সন্তানের কারণে

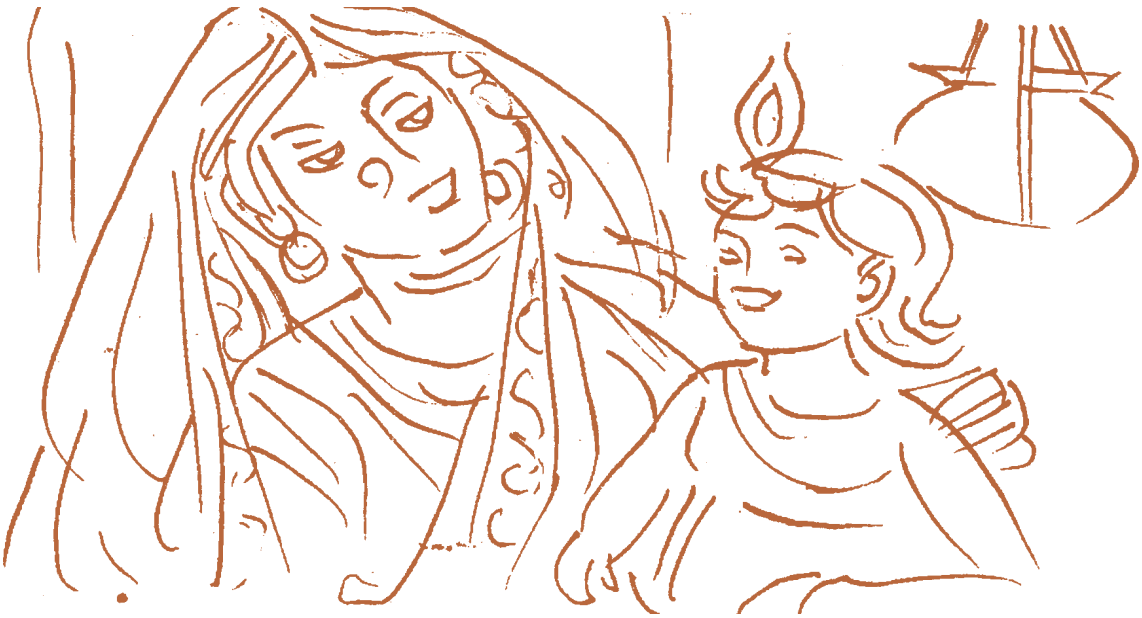

দুঃখবরণ করতে বাধ্য হবেন। তাঁরাই পরবর্তীকালে বসুদেব ও দেবকীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। অভিসম্পাতে বিচলিত অদিতিকে সে সময়ে বিষ্ণু আশ্বাস দিয়েছিলেন, তিনি নিজে জন্মান্তরিত অদিতির সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করবেন।

তখন উগ্রসেন ও দেবক নামে দুই ভাই ছিলেন। উগ্রসেন ছিলেন মথুরার রাজা। তাঁর পুত্রের নাম কংস আর ভাই দেবকের কন্যার নাম দেবকী। কোনো সহোদরা না থাকায় কংস দেবকীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। যথাকালে যদুবংশীয় বসুদেবের সঙ্গে দেবকীর বিয়ে হলো। কন্যা পতিগৃহে যাবার সময় একশো সোনার রথ, চারশো হাতি এবং বিশাল সেনাবাহিনী তাদের সহযাত্রী হলো। কংস বোনের প্রতি স্নেহবশত নিজেই রথের সারথি হলেন। চলতে চলতে পথে হঠাৎ দৈববাণী হলো, 'ওরে নির্বোধ, যাকে তুমি স্নেহবশত রথচালনা করে নিয়ে চলেছো, তারই অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমাকে হত্যা করবে।'

কংস দৈববাণী শুনে ভীত ও ক্রুদ্ধ হয়ে দেবকীর কেশাকর্ষণ করে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। বসুদেব কংসকে শান্ত করার চেষ্টায় বিফল হয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন, তাদের সন্তানের জন্মক্ষণেই তিনি কংসের হাতে তুলে দেবেন। সত্যনিষ্ঠ বসুদেবের কথায় কংস শান্ত হয়ে দেবকীকে হত্যার চেষ্টা থেকে নিরস্ত হলেন। এরপর কংস একে একে বসুদেব-দেবকীর ছ'টি সন্তানকে হত্যা করলেন। সপ্তম সন্তান বলরাম ভ্রূণাবস্থায় নিজেকে বসুদেবের অপর পত্নী রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত করলেন। এরপর দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান হলো। মাতৃহৃদয়ের উচ্ছ্বসিত স্নেহ এবং আসন্ন অনিবার্য বিপদের আশঙ্কায় দেবকী বসুদেবকে অনুরোধ করলেন, শিশু কৃষ্ণকে গোকুলে নন্দ-যশোদার গৃহে রেখে আসবার জন্য। সেইমতো বসুদেব শিশু কৃষ্ণকে নন্দালয়ে রেখে যশোদার সদ্যোজাত কন্যাকে নিয়ে ফিরে আসেন।

কন্যাসন্তানের কান্না শুনে কংস কারাগারে ছুটে এসে সেই কন্যার পা ধরে পাথরে আছাড় মারতে গেলেন। সেই কন্যা তখন ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে যোগমায়া রূপ ধারণ করে বললেন, 'তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।' বলেই অন্তর্হিত হলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে পরে দেবকীর মথুরায় দেখা হয়েছিল। কৃষ্ণকে নিয়ে তিনি সদাশঙ্কিত ছিলেন। কিন্তু বলরাম তাঁকে কৃষ্ণের ঐশীশক্তি ও অবতারত্ব সম্পর্কে জানিয়ে শান্ত করেছিলেন। তাঁকে চিরদিন সন্তান বিচ্ছেদের বেদনা সহ্য করতে হয়েছে। আমরা তাই কৃষ্ণের পালক পিতা-মাতা নন্দ-যশোদার কথা যতটা জানতে পারি, নেপথ্যচারিণী দেবকীকে ততটা নয়।

রূপশ্রী দত্ত

জাতীয় উদ্যান

বক্সা

বক্সা জাতীয় উদ্যান আলিপুরদুয়ার জেলায় অবস্থিত। এই উদ্যানের মধ্যে দিয়ে পানা, ডিমা, রায়ডাক, বালা, গাবুল বাসরা ও সঙ্কোচ নদী প্রবাহিত। বক্সা জাতীয় উদ্যানের প্রবেশদ্বার রাজাভাতখাওয়া। আলিপুরদুয়ার থেকে ১৭ কিলোমিটার দূরে। ৭৬৫ বর্গকিলোমিটার জুড়ে বক্সা অরণ্য। এটি বাঘ, এশিয়ান হাতি এবং অন্যান্য জীবজন্তুর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের পাখি, উভচর ও সরীসৃপের আবাসস্থল। এই উদ্যানের মধ্যে বক্সাদুর্গ নামে প্রাচীন দুর্গ আছে। ইংরেজ আমলে এই দুর্গে সুভাষচন্দ্র বসুকে বন্দি রাখা হয়েছিল। এছাড়া এই উদ্যানের মধ্যে একটি শিবমন্দিরও আছে। স্থানীয় মানুষ মন্দিরটিকে জাগ্রত বলে মনে করেন।

এসো সংস্কৃত শিখি– ৩৭

ক্রিয়াপদপ্রয়োগ: (বর্তমানকালে (লট) প্রথমপুরুষস্য একবচনে)

বালক: কিং করোতি? বালক: গচ্ছতি।

বালিকা কিং করোতি? বালিকা গচ্ছতি।

অভ্যাস করি–

সুভাষ: আগচ্ছতি (সুভাষ আসে)। ছাত্র: পঠতি। বীথিকা নৃত্যতি। মৈনাক: লিখতি। প্রত্যুষা হসতি। রমেশ: খাদতি। লাবণি পশ্যতি। মাধুরী চলতি।

প্রয়োগ করি-১

কারও নাম দিয়ে বাক্য রচনা করতে হবে।

....গচ্ছতি। .... আগচ্ছতি। .... পঠতি। .... লিখতি।

হসতি। ক্রন্দতি। বদতি। গায়তি। ধাবতি। নয়তি। আনয়তি। উত্তিষ্ঠতি। উপবিশতি।

ভালো কথা

আমার স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৫ আগস্ট ছিল ভারতের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস। দিনটি আনন্দের হলেও দুঃখের । এদিন ভারতমায়ের দুই হাত কেটে পাকিস্তান (পশ্চিম ও পূর্ব) তৈরি হয়েছে। এসব কথায় আমি যাচ্ছি না, এদিনটি আমি কীভাবে কাটালাম তা বর্ণনা করছি। এদিন সকালে প্রথমে শাখায় গেলাম। শাখা থেকে ফিরে বাবার সঙ্গে আমাদের বাড়ির ছাদে জাতীয় পতাকা তুললাম। তারপর কাকাইয়ের সঙ্গে আমাদের আরেকটা বাড়িতে পতাকা তুললাম। তারপর কাকাইয়ের সঙ্গেই স্বস্তিকা পত্রিকার কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করা হলো। জাতীয় সংগীত গাওয়া হলো। ওখানে অনেক সংখ্যা ছিল। খুব আনন্দ হলো। তারপর ২৬ নং সঙ্ঘ কার্যালয়ের ছাদে পতাকা উত্তোলন করা হলো। তারপর সবাই মিলে মিষ্টি খাওয়া হলো। দুপুরে বিশ্রাম নিয়ে কাকাইয়ের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াতে গেলাম। সন্ধ্যায় ফিরে এসে পড়তে বসলাম। এককথায় দিনটা খুব আনন্দেই কেটেছে।

বিষ্ণু ঘোষ, ষষ্ঠশ্রেণী, টিপি রোড, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

আমার দেশ

ঐন্দ্রি মহান্ত, তৃতীয় শ্রেণী, নুড়াইপাড়া, সিউড়ী, বীরভূম।

আমরা হলাম ভারতবাসী
দেশকে বড়ো ভালোবাসি,
এই দেশের মাটি
সোনার চেয়েও খাঁটি।

ভারত আমার মা
তার নাইকো তুলনা
বিপদ এলে করব না ভয়
উচ্চৈঃস্বরে বলব 'ভারতমাতার জয়'।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

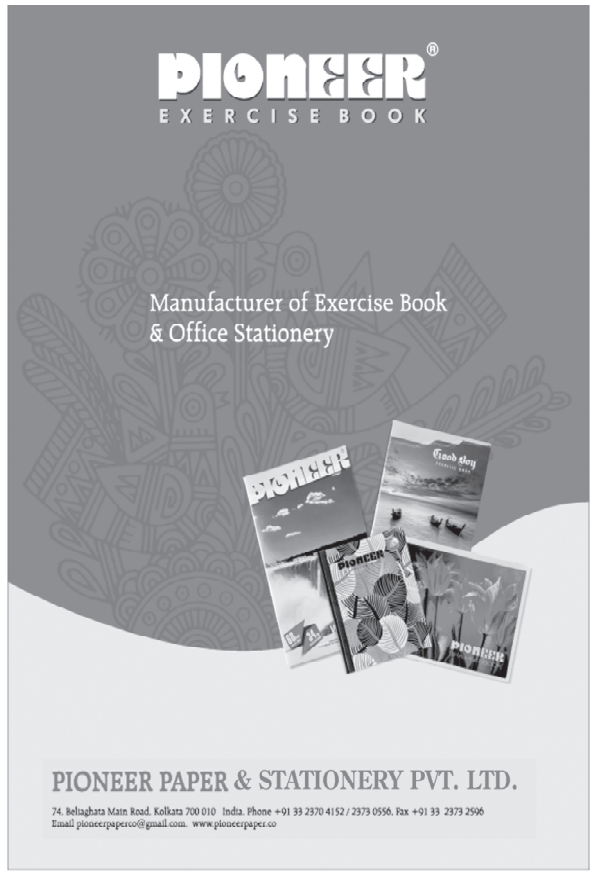

With Best Compliments from -

A
Well wisher

বাংলাদেশে হিন্দুদের পালটা স্লোগান

‘কথায় কথায় বাংলা ছাড়, দেশটা কি তোর বাপ দাদার?’

সাধন কুমার পাল

গত ৫ আগস্ট, ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের মধ্যে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেন এবং দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। তার অনুপস্থিতিতে সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু হয় বাংলাদেশি হিন্দুদের উপর আক্রমণ। দুর্ভাগ্যবশত এই ধরনের ঘটনা বাংলাদেশে হামেশাই ঘটে। কিন্তু এবারের হিন্দু বিরোধী বর্বরতার ক্ষেত্রে জুড়েছে নতুন মাত্রা। হিন্দুরা নিজের যোগ্যতায় যে প্রতিষ্ঠানেই কাজ করুক না কেন বিভিন্ন , তাদের সবাইকে জামাতের ছাত্র সংগঠন জোর করে পদত্যাগপত্র লিখিয়ে সেই প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দিচ্ছে। এই লেখা শেষ করা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপাচার্য সহ ইতিমধ্যেই ৯০ জনেরও বেশি উচ্চ পদে কর্মরত হিন্দুকে জোর করে পদত্যাগপত্র লিখিয়ে প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। তবে বাংলাদেশের ইতিহাসে বোধহয় এই প্রথম হিন্দুরা তাদের উপর হওয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে নেমেছে। হিন্দুদের সিংহবিক্রম দেখে অনেকে অবাক হচ্ছে। এতে জিহাদিরা কিছুটা হলেও ভয় পাচ্ছে। হিন্দুরাও স্লোগান দিচ্ছে ‘কথায় কথায় বাংলা ছাড়, দেশটা কি তোর বাপ দাদার?’, ‘আমার মাটি আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ’। বাংলাদেশের হিন্দুদের এই ধারাবাহিক আন্দোলন দেখে মনে হচ্ছে যে আর আবেদন নিবেদন নয়, এবার অধিকার আদায়ের জন্য চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে হিন্দু সমাজ।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনুসের কাছে পাঠানো হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের খোলা চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘বৈষম্যবিরোধী সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সংস্কারের লক্ষ্যে ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানে যে নবযুগের সূচনা হয়েছে, তারই পতাকা বহনের কাণ্ডারি হিসেবে আপনাকে স্বাগত জানাই, অভিনন্দিত করি। .... জনতার এই বিজয় যখন চূড়ান্ত লক্ষ্য অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছে, অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, একটি বিশেষ গোষ্ঠী সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নির্বিচারে তুলনাহীন সহিংসতা ছড়িয়ে এই অর্জনকে কালিমালিপ্ত করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। প্রাপ্ত সাংগঠনিক বিবরণ এবং গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী ইতোমধ্যে অন্তত ৫২ টি জেলায় এই সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় হাজার হাজার হিন্দু পরিবার সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে। অনেক মন্দির হামলার পর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, অনেক মহিলা নিগৃহীত হয়েছেন। কয়েকটি স্থানে হত্যার ঘটনাও ঘটেছে। আক্রান্ত হয়েছে অন্য সংখ্যালঘুরাও। মূলত ৫ আগস্ট থেকে এই সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সৃষ্টি হয়েছে, যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। সারা দেশের সংখ্যালঘুদের মধ্যে গভীর শঙ্কা, উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা ছড়িয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতি আন্তর্জাতিকভাবেও বাংলাদেশকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। আমরা অবিলম্বে এই অবস্থার অবসান চাই।’

ফঃ ৬

খোলা চিঠিতে বলা হয়, এই পরিস্থিতিতে আমরা রাষ্ট্রপতি, সেনাপ্রধান, সংগ্রামী ছাত্র নেতৃত্ব এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্মানিত নেতৃবৃন্দের কাছে আমাদের বর্তমান সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জানানোর চেষ্টা করেছি। তারাও তাঁদের ভাষণে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি গত তিনদিন ধরে গভীর শূন্যতার মধ্যে পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। আর্তনাদ প্রলম্বিত হচ্ছে।'

সবশেষে বলা হয়, 'অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের সূচনালগ্নেই আপনার কাছে অত্যন্ত বিনীতভাবে আমাদের উদ্বেগ ও বেদনার জায়গাটি তুলে ধরছি এই প্রত্যাশায় যে, আপনি এবং আপনার সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এই সংকট নিরসনে দ্রুত পদক্ষেপ নেবেন, যাতে ছাত্র-জনতার বিজয় কলুষিত না হয়। ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই রক্তক্ষরণের অবসান ঘটে।'

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এবং বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের মতে, ৫ আগস্ট হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ৫২টি জেলায় ২০৫টি হামলার ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে।

৫ আগস্ট বাংলাদেশের মেহেরপুরের ইসকন মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, বিগ্রহ ভাঙচুর করা হয়েছে, আগুন জ্বালানো হয়েছে। নোয়াখালী, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, যশোর, খুলনা, ফেনি গুরুচক্র মন্দির আক্রান্ত হয়েছে। গত ৫ আগস্ট বাংলাদেশজুড়ে কম করে কুড়িটি মন্দিরে হামলা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের হিন্দু পীঠস্থানগুলি আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। রমনা কালীমন্দির ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে বিখ্যাত হিন্দু মন্দিরসমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল। এটি রমনা কালীবাড়ি নামেও পরিচিত। এটি প্রায় এক হাজার বছরেরও পুরাতন বলে বিশ্বাস করা হয় । ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ পাকিস্তানী সেনাবাহিনী রমনা কালী মন্দির কমপ্লেক্সে প্রবেশ করে এবং এক ঘণ্টার মধ্যে ১০০ জনেরও বেশি লোককে হত্যা করে। মন্দির চত্বরে আশ্রয় নেওয়া বেশ কিছু মুসলমানকেও হত্যা করা হয়। গুড়িয়ে দেওয়া হয় রমনা কালীমন্দির।

চট্টগ্রামের কাছে চন্দ্রনাথধাম হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান। ভক্তদের বিশ্বাসযে, এখানে মাতা সতীর ডান হাত পড়েছিল। এক হাজার কুড়ি ফুট উচ্চতায় পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই মন্দির হিন্দুদের পবিত্র আস্থাস্থল বলে পরিচিত। বহু পুণার্থী এখানে আসেন তাঁদের মনস্কামনা পূরণের জন্য। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাস থেকেই মন্দিরের চত্বরে নামাজের আয়োজন করে মোল্লাবাদীরা এবং মন্দিরের পাশেই একটি মসজিদ বানানোর পরিকল্পনা শুরু করে। ২০২৪-এর জানুয়ারিতে দুষ্কৃতী হামলায় চন্দ্রনাথ ধামের ১০ জন ভক্ত আহত হয়েছেন। ২০২২ সালের পর থেকেই চন্দ্রনাথ মন্দিরের আশপাশের এই দোকানগুলিতে গোমাংস রান্না করার অভিযোগ ওঠে এবং কিছু উগ্র মোল্লবাদী সংগঠনের সদস্যরা পাহাড়ি এই মন্দিরে ঘনঘন যাতায়াত শুরু করে। বর্তমানে উগ্রপন্থী মুসলমানরা মন্দির চত্বরে 'আল্লাহু আকবর' এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ধ্বনি তুলছে এবং মন্দিরকে ঘিরে উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখছে। বাংলাদেশের আরও যে মন্দিরগুলি আছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো মুঘল আমলে নির্মিত উলিপুরের ধামশ্রেণী সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, মহেশখালীর আদিনাথ মন্দির এবং রাজশাহীর পুঁথিয়া মন্দির চত্বর। এছাড়াও আছে চট্টগ্রামের চট্টেশ্বরী মন্দির। এছাড়াও সেখানের নারায়ণগঞ্জের বারদীতে বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী এবং বরিশাল-সহ নানা জায়গায় আছে শ্রীশ্রীহরিচাঁদ গুরুচাঁদ মন্দির। এই মন্দিরগুলির নিরাপত্তা ও পবিত্রতাও প্রশ্নের মুখে।

বাংলাদেশে হিন্দুদের শ্রদ্ধাস্থল লক্ষ্য করে ধারাবাহিক আক্রমণের ইতিহাস

বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর চলমান আক্রমণ সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে হিন্দুদের লক্ষ্য করে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির সঙ্গে বিগত ২২ বছরের হামলার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হলো।

২০০১ : ভোলা হিংসা

ডিসেম্বর ২০১৯ : নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের সংসদীয় আলোচনা চলাকালীন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা হিন্দুদের চলমান নিপীড়নের দৃষ্টান্ত হিসেবে ভোলার হিংসার ঘটনা তুলে ধরেন। তিনি খালেদা জিয়োর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি (বিএনপি) ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই ২০০১ সালে ভোলায় ধারাবাহিক নৃশংস হামলার কথা উল্লেখ করেন। নির্বাচনে জয়ের পর বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামির সমর্থকরা বাগেরহাট, বরিশাল, বগুড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চিতগাঁও, ফণী, গাজীপুর, যশোর, খুলনা, মুন্সীগঞ্জ, ভোলা, নারায়ণগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ-সহ বিভিন্ন জেলায় হিন্দুদের ওপর হামলা চালায়। ২০০১ সালের অক্টোবরে, ভোলার লালমোহন অঞ্চল চরম হিংসার সাক্ষী হয়। হিন্দুদের বাড়িতে হামলা, লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়; কেটে ফেলা হয় বাগান, নষ্ট করা হয় ফসল। মুসলমান জনতা ২০০ জনেরও বেশি হিন্দু মহিলাকে ধর্ষণ করে। ৪ বছরের শিশু থেকে শুরু করে ৭০ বছর বয়সি মহিলা পর্যন্ত বাদ যায় নি আক্রমনের হাত থেকে। পরবর্তী জুডিশিয়াল কমিশনের তদন্তে জানা যায় যে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামির ২৫ হাজারেরও বেশি নেতা ও স্থানীয় দলীয় কর্মী এসব হামলায় জড়িত ছিলেন। এই হিংসার ফলে অসংখ্য মৃত্যু ও আহত হয় এবং অনেক হিন্দু ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

১৮ নম্বের, ২০০৩ : বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলায় একটি হিন্দু পরিবারের ১১ সদস্যকে নির্মমভাবে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। তেজেন্দ্রলাল শীলের নেতৃত্বে নিহতরা সাধনপুর গ্রামের শীলপাড়ায় বসবাস করতেন। হামলার আগে আততায়ীরা শীলকে তার সম্পত্তি ছেড়ে দেওয়ার জন্য জোর করার চেষ্টা করেছিল। তিনি রাজি না হলে হামলাকারীরা তার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মোক্তার আহমদের নির্দেশে মাহবুব রশিদ বাড়ির দরজা-জানালা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে পরিবারের সবাইকে আটকে রাখে। রুবেল নামে আরেক হামলাকারী, তারপর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়, যার ফলে ছয় শিশু-সহ ১১ জন মারা যায়।

২০১২ : হাটহাজারী এবং ফতেহপুরে হিন্দুদের দোকান ও বাড়িতে জামায়েতে ইসলামির হামলা।

২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে নভেম্বরের মধ্যে এবং ২০১৩ সালের শুরুর দিকে হাটহাজারী, বাশখালী, চট্টগ্রাম, সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ, দিনাজপুরের

চিরিরবন্দর, কক্সবাজারের রামু, সাথনা-সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দুদের ওপর ধারাবাহিক হামলা চালানো হয়।

৯-১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ তারিখে হাটহাজারীতে আক্রমণ শুরু হয়, যেখানে জামায়াত-ই-ইসলামি বাংলাদেশের ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্র শিবিরের সদস্যরা স্থানীয় মুসলমানদের হিন্দু সম্পত্তিতে হামলা চালাতে উস্কানি দিয়েছিল। এই পরিকল্পিত আক্রমণের ফলে আটটি মন্দির, বারোটি দোকান এবং অসংখ্য বাড়িঘর ধ্বংস হয়।

এই ঘটনার পর প্রায় এক দশক পেরিয়ে গেছে, তবুও হিন্দু নির্যাতিতদের জন্য ন্যায়বিচার অধরা রয়ে গেছে, যারা হামলার পরও এখনো ভুগছে।

হাটহাজারীতে ২০১২ সালের হিংসা : বাংলাদেশের একটি মোল্লাবাদী গোষ্ঠী জামায়াত-ই-ইসলামির পরিকল্পিত হামলার সূচনা করে। হাটহাজারীর ঘটনার পর, ২০১২ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে সাতক্ষীরার ফতেহপুর ও চাকদহে আক্রমণ শুরু হয়। এই হামলার সময় তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের সমর্থনকারী মুসলমানদের বাড়ি-সহ বেশ কিছু হিন্দুবাড়ি ধ্বংস করা হয়। অন্তত ১২টি বাড়ি ছাই হয়ে গেছে, এবং দু'টি গ্রাম দুই দিনের মধ্যে ব্যাপকভাবে ভাঙচুর করা হয়েছে।

৩১মার্চ , ২০১২ : জামাতপন্থী একটি স্থানীয় সংবাদপত্র 'দৈনিক দৃষ্টিপাত' মিথ্যা দাবি করে যে একটি স্কুলের নাটকে নবী মুহাম্মদ সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়েছে। কাগজটি ব্যাপকভাবে অনুলিপি বিতরণ করেছে, হিন্দু সম্পত্তি আক্রমণ ও লুট করতে ইসলামপন্থীদের প্ররোচিত করেছে। হিংসার তীব্রতা সত্ত্বেও পুলিশ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিস্থিতি উপেক্ষা করে, যার ফলে প্রায় ১০টি হিন্দু বাড়ি লুট ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

প্রাথমিকভাবে, মূলধারার বাংলাদেশি মিডিয়া ঘটনাগুলিকে অনেকটাই উপেক্ষা করেছিল। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে হিন্দু ছাত্ররা নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার পরে মিডিয়া নড়েচড়ে বসে।

৪ আগস্ট, ২০১২ : বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলায় হিন্দুদের উপর স্থানীয় জেহাদিরা হামলা চালায়। এই পূর্বপরিকল্পিত হামলার ফলে ৫০টি হিন্দু পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ : ইসলামিক চরমপন্থীরা বাংলাদেশের কক্সবাজারের রামুতে একটি বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকাকে লক্ষ্য করে। বৌদ্ধ যুবক উত্তম কুমার বড়ুয়ার একটি ভুয়ো ফেসবুক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এই আক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে, যেটিতে নাকি কুরানের অবমাননা দেখানো হয়েছে। মুসলমানরা বড়ুয়ার বিরুদ্ধে ইসলাম অবমাননার অভিযোগ এনে ওই এলাকার বৌদ্ধবিহার ও হিন্দু মন্দিরে হামলা চালায়। সহিংসতা শীঘ্রই কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলা এবং চট্টগ্রামের পাটিয়া উপজেলায় ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের ধর্মস্থান ধ্বংস করা হয়।

২০১৩ : যুদ্ধাপরাধের রায়ের পর বাংলাদেশে হিন্দুবিরোধী আক্রমণ

২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের জন্য জামায়াতে ইসলামির সহ-সভাপতি দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। প্রতিশোধ হিসেবে, জামায়াতে ইসলামি এবং তার ছাত্র সংগঠন, ইসলামি ছাত্র শিবির, সারা বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ শুরু করে।

পরবর্তী আক্রমণের ফলে পুলিশকর্মী-সহ ১০০ জনেরও বেশি মৃত্যু ঘটে এবং ব্যাপক লুটপাট, সম্পত্তির ক্ষতি এবং হিন্দুদের বাড়িঘর ও মন্দির পুড়িয়ে দেয়। সংখ্যালঘু নেতাদের রিপোর্ট অনুমান করে যে, ২০১৩ সালের হিন্দু বিরোধী সহিংসতার সময় ২০টিরও বেশি জেলা জুড়ে ৫০টিরও বেশি হিন্দু মন্দির এবং ১,৫০০টি হিন্দু বাড়ি ধ্বংস করা হয়েছিল।

২০১৪ ঃ এই বছর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং তার সহযোগী জামায়াতে ইসলামির বয়কট আহ্বানকে অস্বীকার করে হিন্দুরা দশম সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ শুরু হয়। নির্বাচনের পর, বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামির কর্মীরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়, বিভিন্ন জেলা জুড়ে তাদের লক্ষ্য করে। পরবর্তীকালে, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, লালমনিরহাট, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও যশোর সহ বেশ কয়েকটি অঞ্চলে হিন্দুদের বাড়িঘর লুট, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এই হিংসা শত শত হিন্দুকে গৃহহীন করে এবং এর ফলে অসংখ্য হিন্দু মন্দির ধ্বংস হয়। অস্থিরতার এই সময়টিতে ব্যাপক সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে, হিন্দু ধর্মীয়স্থান এবং বাড়িগুলি আক্রমণ দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

২০১৬ নাসিরনগর এবং ২০১৭ রংপুর হিংসা : বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণ অক্টোবর ২০১৬ : বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলায় একটি কথিত ফেসবুক পোস্টের জন্য একটি মুসলমান জনতা হিন্দুদের উপর আক্রমণ করে। একজন হিন্দু সোশ্যাল মিডিয়ায় ইসলামের অবমাননা করেছে এমন অভিযোগ তুলে আক্রমণ শুরু করে, যার ফলে ৩০০টিরও বেশি হিন্দু বাড়ি লুট হয় এবং কমপক্ষে ১৯টি মন্দির অপবিত্র হয়। হিংসায় আনুমানিক ১০০ জন আহত হয়েছে, যার মধ্যে বেশ কয়েকজন মন্দির ভক্তও রয়েছেন। হিন্দুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, যখন রংপুর সদর উপজেলার ঠাকুরপাড়া গ্রামে একই ধরনের ঘটনা ঘটে। ১০ নভেম্বর, ২০১৭ সালে মুসলমান জনতা ৩০টি হিন্দু বাড়ি লক্ষ্য করে, লুটপাট, ভাঙচুর এবং আগুন লাগিয়ে দেয়। টিটু রায়, মূলত ঠাকুরপাড়ার বাসিন্দা কিন্তু নারায়ণগঞ্জে বসবাসকারী, ফেসবুকে নবী মুহাম্মদকে নিয়ে অবমাননাকর কন্টেন্ট পোস্ট করেছেন বলে গুজবের কারণে আক্রমণ শুরু

পাত্রী চাই

কলকাতা মানিকতলা নিবাসী ডাক্তার পাত্রের জন্য কলকাতা অথবা পার্শ্ববর্তী জেলা নিবাসী, পশ্চিমবঙ্গীয় বনেদি পরিবারের ২৫ অনূর্ধ্বা, শিক্ষিতা, ৫'৫", সুশ্রী, সুপাত্রী চাই। ডাক্তার পাত্রী অগ্রগণ্যা। দেবারি কিংবা দেবগণ কাম্য।
যোগাযোগ : ৮৭৭৭৮১৬৪০০

হয়। ফলে একজন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়। প্রতিবাদকারীরা টিটুর বাড়িও পুড়িয়ে দেয়। পরে একটি তদন্তে জানা যায়, আপত্তিজনক পোস্টগুলি টিটু রায়ের নয়, একই নামে একটি ভিন্ন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে করা হয়েছিল।

২০১৯ : বোরহানউদ্দিন উপজেলায় আক্রমণ

অক্টোবর ২৩, ২০১৯ : বিপ্লবচন্দ্র বৈদ্য নামে একজন স্থানীয় হিন্দু যুবক ফেসবুকে ইসলাম সম্পর্কে একটি নিন্দামূলক মন্তব্য পোস্ট করেছেন এমন গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর বাংলাদেশের ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় গুরুতর এক ভয়ংকর হিংসাত্মক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এর ফলে পুলিশ ও স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, যারা বৈদ্যের শাস্তি দাবি করে। হিংসার ফলে চারজন নিহত হয় এবং দশজন পুলিশ-সহ শতাধিক আহত হয়। অশান্তির সময় হিন্দু সম্পত্তিগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল। ১২টি বাড়ি এবং একটি মন্দির ভাঙচুর করা হয়েছিল, একটি বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছিল এবং একটি মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী তদন্তে জানা যায় যে নিন্দামূলক পোস্টটি আসলে দুই মুসলমানের দ্বারা করা হয়েছিল, বৈদ্যের নয়।

২০২০ : বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দুদের উপর হামলা বৃদ্ধি পায়।

২০২০ মে মাসে বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে বর্বরতা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। এই সময় মাত্র এক মাসে অন্তত ৩০টি হামলার খবর পাওয়া গেছে। বিশ্বহিন্দু ফেডারেশন, বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সহিংসতার ফলে চারটি হত্যা, ১২টি লুটপাটের ঘটনা, ৪৩৫ একর হিন্দু জমির অবৈধ দখল এবং ৪৩টি হিন্দু পরিবারকে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে, ১০টি পরিবারকে নির্বাসনে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। ব্লাসফেমির মিথ্যা অভিযোগের ফলে একজন হিন্দু ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরবর্তীতে তার বাড়িতে লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়।

১১ সেপ্টেম্বর, ২০২০ : বাংলাদেশের গাজীপুর শহরের কালী মন্দির অপবিত্র হয়েছিল যখন অজ্ঞাত দুষ্কৃতীরা হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ভাঙচুর করেছিল। হামলাকারীরা ভোররাতে মন্দিরে প্রবেশ করে এবং চারটি মূর্তি অপবিত্র করে সেগুলির মাথা ভেঙে ফেলে দেয়। মন্দিরের সভাপতি নরেশ রায় সন্দেহ করেন যে মন্দিরের জমি দখল করতে আগ্রহী প্রভাবশালী স্থানীয়দের দ্বারা এই হামলার পরিকল্পনা করা হতে পারে। তিনি এই ঘটনাটি ব্যাপকভাবে নিন্দা করেন এবং এই অঞ্চলে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ ও হুমকির কথা তুলে ধরেন।

১৮ মার্চ, ২০২১ : ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশংকৈল উপজেলার উত্তরগাঁও গ্রামে দুর্বৃত্তরা স্থানীয় একটি মন্দিরে মা কালীর মূর্তি আক্রমণ করে ক্ষতিগ্রস্ত করে। হামলাকারীরা মন্দির ভাঙচুর করে এবং কালীমূর্তিতে আগুন ধরিয়ে দেয়, যার ফলে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরের প্রতিবাদে হিন্দু মন্দিরগুলোকে টার্গেট করেছে জেহাদিরা। হেফাজতে ইসলামির সদস্যরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় একটি ট্রেনে হামলা চালায়, ১০ জন আহত হয় এবং ট্রেনের ইঞ্জিন রুম ও বগি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এপ্রিল ২০২১ : সাতক্ষীরা জেলার ফুটালা গ্রামে, একাধিক হিন্দু বাড়ি এবং একটি স্থানীয় মন্দিরে হামলা করা হয়। হামলাকারীরা বাড়িঘর লুট করে, তিনটি মন্দিরের মূর্তি অপবিত্র করে এবং কমপক্ষে ১০ জন হিন্দুকে আহত করে।

অক্টোবর ২০২১ : দুর্গা পূজার সময় হিন্দুদের লক্ষ্য করে বাংলাদেশে সহিংসতার একটি ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। কুমিল্লায় একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে সহিংসতা শুরু হয়েছিল, যেখানে একটি কুরান ইচ্ছাকৃতভাবে একটি দুর্গামন্দিরে রেখে দেওয়া হয়েছিল, যা হিন্দুদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলেছিল। এই মিথ্যা অভিযোগ দেশব্যাপী ধ্বংসের সূচনা করে, যার ফলে চাঁদপুর, চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালী-সহ ৩০টি জেলা জুড়ে ৩১৫টিরও বেশি মন্দিরে এবং ১,৫০০টি বাড়ি ভাঙচুর হয়। সংগঠিত হামলার ফলে কমপক্ষে ১০ জন হিন্দু নিহত হয় এবং অনেক নারী ধর্ষিতা হয়। নোয়াখালীতে ইসকন মন্দিরের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে, এক ভক্ত নিহত হয়েছে। এই হিংসার মধ্যে রয়েছে হিন্দুদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া এবং রংপুরে ২০টিরও বেশি মন্দির অপবিত্র করা। এই হামলাগুলি বাংলাদেশে হিন্দুদের চলমান বিপদের চিত্র তুলে ধরেছে, বিশেষ করে ধর্মীয় উৎসবের সময়।

২০২২ সালে, বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে হিংসা অব্যাহত রয়েছে।

১৭ মার্চ, ২০২২ : ঢাকার লালমোহন সাহা স্ট্রিটে একটি ইসকন মন্দিরে ৬২ বছর বয়সি হাজি শফিউল্লার নির্দেশে ১৫০ থেকে ২০০ জন লোক আক্রমণ করেছিল। হামলাকারীরা মূর্তি অপবিত্র করে, মন্দির ভাঙচুর করে এবং মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে। ভক্ত সুমন্ত্রচন্দ্র শ্রাবণ, নিহার হালদার ও রাজীব ভদ্রকে আহত করে।

২৪ এপ্রিল, ২০২২ : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সিলেটে একটি ইফতার পার্টিতে হিন্দু সদস্যদের গোমাংস পরিবেশন করলে বিতর্ক শুরু হয়। হিন্দু আমন্ত্রিতদের গোমাংস পরিবেশন করা হয়েছিল।

১৫ জুলাই, ২০২২ : নড়াইলের সাহাপাড়া, লোহাগড়ায় মুসলিম জনতা একটি মন্দির, মুদি দোকান এবং একাধিক বাড়ি ভাঙচুর করে। মুসলমান অনুভূতির প্রতি আপত্তিকর বলে একটি ফেসবুক পোস্টের জন্য এই হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযুক্তের পরিবারের মুদির দোকানে হামলা চালায় উত্তেজিত মুসলমানরা।

২৫ জুলাই, ২০২২ : শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলা থেকে অনুরাধা সেন নামে এক হিন্দু মেয়েকে অপহরণ করে হত্যা করা হয়। সন্দেহভাজনকারী এক জেহাদি, এর

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

আগে তার পরিবারকে হুমকি দিয়েছিল।

২৯ জুলাই, ২০২২ : দিনাজপুরের ভেড়বেদী ইউনিয়নের হিন্দু মহিলা অপোরানী রায়কে গণধর্ষণ ও হত্যা করা হয়। ধানের ক্ষেতে তার দেহ পাওয়া এবং একটি ১০ বছর বয়সি মেয়ে তার কাছাকাছি অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায়। হামলাকারীদের শনাক্তকরণ এড়াতে মেয়েটিকে হত্যা করা হয়েছে।

৮ আগস্ট, ২০২২ : কাইনমারী মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুরের অভিযোগে তিন মাদ্রাসা ছাত্রকে আটক করে মোংলা পুলিশ। মন্দিরের মাঠে ফুটবল খেলা নিয়ে বিরোধের পর এই হামলা হয়, যার ফলে মাকালী এবং ভগবান গণেশ মূর্তি ধ্বংস হয়।

সেপ্টেম্বর, ২০২২ : দুর্গাপূজার আগে, বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার কাশিপুর সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরে ভাঙচুরকারীরা প্রতিমা ভাঙচুর করে। মন্দিরে সিসিটিভির অভাব ছিল, যা ঘটনার তদন্তকে জটিল করে তুলেছে।

৭ অক্টোবর, ২০২২ : ঝিনাইদহের দাউটিয়া গ্রামে একটি কালী মন্দির ধ্বংস করা হয়। মন্দির থেকে আধা কিলোমিটার দূরে কালী মূর্তিটি ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে। দুর্গাপূজার পরপরই এই হামলার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাগুলি বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে একটি উদ্বেগজনক প্রবণতাকে প্রতিফলিত করে, যা দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য অনিশ্চিত পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে।

১৫ জানুয়ারি, ২০২৩ : বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার উত্তর কান্দি গ্রামে একটি যুবককে ব্লাসফেমির অভিযোগে মোল্লাবাদী জনতা একটি হিন্দু বাড়িতে ভাঙচুর করে। অভিযুক্ত অনেক বছর ধরে ভারতে বসবাস করছিলেন, বাংলাদেশে উপস্থিত ছিলেন না, তবে তার পরিবার তাদের সম্পত্তি ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে, এই হামলায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

জানুয়ারি ২৬, ২০২৩ : নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার নারাইচ গ্রামে ৯-১০ জনের একটি দল সরস্বতী পূজায় হামলা চালায়। ছবি তুলতে বারণ করায় সরস্বতী প্রতিমা ভাঙচুর করে তারা। হামলাকারীরা হাতনাইয়া গ্রামের স্থানীয় কিশোর হিসেবে চিহ্নিত, পূজা অনুষ্ঠান ব্যাহত করে এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দুর্ভোগ সৃষ্টি করে।

ফেব্রুয়ারি ৫, ২০২৩ : উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশে রাতারাতি অন্তত ১৪টি হিন্দু মন্দিরে হামলা ও ভাঙচুর করা হয়। সিন্দুরপিন্ডি, কলেজপাড়া ও সাহবাজপুর নাথপাড়ার মন্দিরগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, মূর্তিগুলি ভেঙে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে, এই হামলার পিছনে সত্য উদ্‌ঘাটনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

১৩ অক্টোবর, ২০২৩ : বাংলাদেশের কুমিল্লায়, দুর্গাপূজা সম্পর্কে এমপি বাহাউদ্দিন বাহারের অবমাননাকর মন্তব্যের বিরুদ্ধে হিন্দুদের একটি প্রতিবাদ মিছিলে হামলা হয়। বেশ কয়েকটি হিন্দু সংগঠনের দ্বারা আয়োজিত বিক্ষোভটি নজরুল এভিনিউতে সহিংসতার সম্মুখীন হয়, যার ফলে আদিত্য দাস, সুনীল দাস ও তন্ময় দাস-সহ অংশগ্রহণকারীরা গুরুতর আহত হয়।

৬ নভেম্বর, ২০২৩ : শৈলকুপা উপজেলার বিজুলিয়া গ্রামে একটি হিন্দু মন্দির অপবিত্র করা হয়। ঘটনাটি ২০২২ সালের অক্টোবর থেকে অনুরূপ একটি ঘটনা অনুসরণ করে, যেখানে একটি কালীমূর্তি ভাঙচুর করা হয়েছিল। স্থানীয় হিন্দুরা আসন্ন নির্বাচনের মধ্যে শান্তির আশা প্রকাশ করেছেন, আরও ঘটনার আশঙ্কা করছেন।

১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ : বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলায় তিনটি হিন্দু মন্দিরের দশটি মূর্তি ভাঙচুর করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত মন্দিরগুলির মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় হরি মন্দির, শ্রীশ্রী বিষ্ণু পাগল মন্দির এবং শ্রীশ্রী দামোদর আখড়া।

এখানে বিগত ২২ বছরের ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনার মধ্যে কয়েকটি মাত্র তুলে ধরা হলো। কিন্তু হিন্দু মন্দির ভাঙার এই পরম্পরা বিগত ১০০ বছর ধরে চলছে ধারাবাহিকভাবে। শুধু বাংলাদেশ কেন, ভারতবর্ষের যেখানেই হিন্দুরা সংখ্যালঘু সেখানেও একই রকমভাবে চলে হিন্দুদের শ্রদ্ধারস্থল নিয়ে সীমাহীন বর্বরতা। বাংলাদেশে এটা বন্ধ করার একমাত্র উপায় হিন্দুদের জন্য একটা পৃথক হোমল্যান্ড তৈরি করা। যেখানে প্রশাসন থাকবে হিন্দুদের হাতে, হিন্দুদের ভাগ্য হিন্দুরাই নির্ধারণ করবে। ইসলামি দেশে এই সেকুলারিজম সোনার পাথরবাটির মতো একটি অসম্ভব ব্যাপার। □

শোক সংবাদ

হাওড়া শিবপুরের বিশিষ্ট অধ্যাপক ও গবেষক ড. আনন্দমোহন গুপ্ত গত ১১ আগস্ট পরলোকগমন করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, কন্যা-জামাতা, দুই ভাই- সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধকে রেখে গেছেন। হাওড়া শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করতেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি অতিথি অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছেন। লিখেছেন 'আমাদের হাওড়া', 'প্রসঙ্গ নগরায়ন'-সহ কয়েকটি গবেষণাধর্মী বই। নানা গঠনমূলক সামাজিক কাজেও তাঁর ছিল যোগাযোগ। তিনি স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন সমিতির হাওড়া মহানগরের সদস্য ছিলেন।

* * *

মেদিনীপুর জেলার রাউতড়া গ্রামের স্বয়ংসেবক তথা পূর্বতন জেলা সেবাপ্রমুখ সৌমেন মালস গত ১৯ আগস্ট পরলোকগমন করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র ও ২ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা পূর্ব বিভাগ কার্যবাহ নবকুমার সরকারের মাতৃদেবী গৌরীরানী সরকার গত ৯ আগস্ট পরলোকগমন করেন। তিনি ২ পুত্র, ২ পুত্রবধূ-সহ ২ নাতনি রেখে গেছেন।

বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে রূপরেখা প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আগামীতে বিকশিত ভারত গড়ার ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তার একটি রূপরেখা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। স্বাধীনতা দিবসে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যের একটা বড়ো অংশজুড়ে ছিল বিকশিত ভারতের কথা। ২০৪৮ সালের মধ্যে ভারতবর্ষকে কীভাবে বিকশিত ভারত হিসাবে গড়ে তোলা যায়, তার একটা রূপরেখা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, 'ভারতকে বিকশিত করতে হলে ভারতে প্রাচীন শিক্ষা-সংস্কৃতি সহ ভারতীয় পরম্পরাকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।' শুধু তাই নয়, উচ্চশিক্ষার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষকে 'বৈশ্বিক শিক্ষা হাবে' পরিণত করার পরিকল্পনা তাঁর ভাষণের মধ্যে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি তাঁর ভাষণে গুরুত্বপূর্ণ একাধিক বিষয়গুলি ওপর

আলোকপাত করেন। সেগুলির মধ্যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য পুনর্জ্জীবিত করা।

বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে তিনি স্বচ্ছভারত মিশনের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেন। তিনি তাঁর দীর্ঘ ভাষণে, বিনিয়োগ আনতে দেশের প্রতিটা রাজ্যের রাজ্য সরকারগুলির. স্বচ্ছ নীতির তৈরি করার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি তিনি সুশাসন ও রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর জোর দেন। জলবায়ু পরিবর্তনের লক্ষ্যমাত্রা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানান, জি২০ দেশগুলোর মধ্যে ভারত একমাত্র দেশ যারা প্যারিস চুক্তি অনুসরণ করে চলে। ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন করাই ভারতের লক্ষ্য। বিকশিত ভারত গড়ার ক্ষেত্রে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা ও তার পরিকাঠামোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন তিনি। তিনি জানান, আগামী ৫ বছরের মধ্যে দেশে মেডিক্যাল শিক্ষায় ৭৫০০০ আসন বাড়ানো হবে। এছাড়াও পরিবারতন্ত্র ও শ্রেণী বিভাজন দুর করতে, তিনি যুব প্রজন্মকে রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্ত হবার ডাক দেন। বিশেষ করে যাদের পরিবারে কোনো রাজনীতির অভিজ্ঞতা নেই।

বাংলাদেশের হিন্দুরা ধর্মান্তরণের শিকার : অমিত শা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশে হিন্দুদের বলপূর্বক ধর্মান্তরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। গত ১৮ আগস্ট সিএএ-র মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে ভারতে আসা ১৮৮ জন হিন্দুর হাতে ভারতীয় নাগরিকত্বের শংসাপত্র তুলে দেন অমিত শা। আমেদাবাদের সেই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বাংলাদেশ ইস্যুতে সোচ্চার হন তিনি। কেন বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা দ্রুত হারে কমে চলেছে সেই প্রশ্ন তোলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এবিষয়ে তিনি বলেন— 'যখন দেশভাগ হয় তখন পূর্ববঙ্গে ২৭ শতাংশ হিন্দু ছিলেন। এখন তা কমে ৯ শতাংশ হয়েছে। তাদের জোর করে ধর্ম পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হয়েছে, নয়তো তারা শরণার্থী হয়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। প্রতিবেশী দেশে হিন্দুরা সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে না পারলে যদি শরণার্থী হয়ে এদেশে চলে আসেন, তবে কি আমরা নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকব? সেটা আমরা করতে পারি না'। তিনি আরও বলেন, 'কিছু রাজ্যের সরকার এবং কিছু রাজনৈতিক দল সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। বহু আগে পূর্ববঙ্গ থেকে চলে এসেছেন অনেক মানুষ। তাঁরা এখানে চাকরি বা অন্য কাজ করছেন। এখন তাঁরা নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করলে আইনি সমস্যা হবে বলে তাঁদের ভুল বোঝানো হচ্ছে। আপনারা শুনে রাখুন, আমি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে বলছি, কোনো ভয় পাবেন না। আপনারা নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করুন। এতদিন এখানে চাকরি করলে বা জমি-বাড়ি কিনে থাকলে নাগরিকত্ব কার্যকর হতে কোনো সমস্যা হবে না। কোনো মামলার সমস্যাতেও পড়তে হবে না'। গত ৫ আগস্টের পর থেকে বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দুরা দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হচ্ছেন। এই বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপরই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেভাবে বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ব্যাপক ভাবে কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে সেই দেশে বলপূর্বক ধর্মান্তরণের বিষয়টি তুলে ধরেছেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর জেহাদি সন্ত্রাসে উদ্বেগ প্রকাশ সরসঙ্ঘচালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর সন্ত্রাসবাদী-জেহাদিদের হামলার ঘটনা নিয়ে উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত। গত ১৫ আগস্ট নাগপুরে সঙ্ঘের সদর কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মোহনজী। সেখানে তিনি বাংলাদেশের বর্তমান অস্থিরতা, বিশেষ করে যে চ্যালেঞ্জগুলির সম্মুখীন সেখানকার হিন্দুসমাজ— সেই বিষয়গুলি উল্লেখ করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন— 'প্রতিবেশী দেশে প্রবল অশান্তি চলছে। সেখানে বসবাসকারী হিন্দু ভাইদের কোনো দোষ ছাড়াই এই অশান্তির চাপ সহ্য করতে হচ্ছে'। স্বাধীনতা দিবসের দিন তাঁর পরামর্শ, 'শুধুমাত্র নিজের স্বাধীনতা রক্ষা নয়, আমাদের উচিত বিশ্বব্যাপী কল্যাণে অবদান রাখার ঐতিহ্যকে বজায় রাখা। গত কয়েক বছরে সবাই দেখেছেন যে আমরা কাউকে আক্রমণ করিনি। যখনই কেউ সমস্যায় পড়েছে, আমরা তাদের সাহায্য করেছি'। অন্যদিকে, জেহাদি হিংসার হাত থেকে বাংলাদেশের হিন্দুদের রক্ষার উপায় সন্ধানে সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহের বাসভবনে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হন সঙ্ঘ ও বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, বিজেপির সর্বভারতীয়

সভাপতি জেপি নাড্ডা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে-সহ অন্যান্য শীর্ষস্থানীয়রা। সাড়ে ছ'ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা এই বৈঠকে বাংলাদেশের বর্তমান সংকট মোকাবিলা এবং হিংসায় আক্রান্ত হিন্দুদের নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের বিষয়টি আলোচিত হয়। মানবাধিকার ও সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য কাজ করা আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির কাছে কীভাবে পৌঁছানো যায়, তা নিয়েও আলোচনা করেন শীর্ষস্থানীয়রা।

জেহাদি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের হিন্দুদের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ার পর লালমণিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলায় বড়োখাতা ইউনিয়নের বুড়া সারডুবি গ্রামে ১৮টি পরিবারের ঘরবাড়িতে লুঠপাট চালিয়ে সেগুলি পুড়িয়ে দেয় জেহাদিরা। এর পাশাপাশি তিনটি মন্দিরে তারা হামলা চালায় এবং স্থানীয় একটি শ্মশানের ৭০ শতাংশ জমি দখল করে নেয়। সন্ত্রাসীদের আক্রমণে হিন্দু পরিবারগুলির (বাংলাদেশি অর্থে) প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। স্বপন কুমার, তপন কুমার, নিরোধ রায়, সত্য কুমার, সানু, সুনীল, বিষ্ণু, রতন, দেবেশ্বর, সুধীর, সর্বেশ্বর, কার্তিক, কৃষ্ণ, শ্যামল, সবুজ, গিরীন্দ্র, সোনু ও নিরঞ্জনের পরিবারগুলি এই জেহাদি আক্রমণের শিকার। সত্য কুমার জানান যে এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে তাদের কাউকে কোনো সহযোগিতা করা হয়নি। 'সনাতনী অধিকার আন্দোলন, হাতিবান্ধা' থেকে তাদের কিছু সাহায্য করলেও তার পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়। পরিবারগুলির ঘরবাড়ি-বিষয় সম্পত্তি সব পুড়ে ছাই। অসহায় পরিবারগুলি হারিয়েছে তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই। ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ারও চেষ্টা চলছে বলে আক্রান্তরা জানিয়েছেন।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দেওয়ালে সম্পূর্ণরূপে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পর ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। ঢাকা, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, সিলেট, সুনামগঞ্জ, রংপুর, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, বরিশাল, যশোর, খুলনা প্রভৃতি এলাকায় হিন্দুদের তরফে সংঘটিত হয়েছে আড়াইশোটিরও বেশি প্রতিবাদী জমায়েত ও পদযাত্রা। বাংলাদেশের মধ্যেই জোরালো হয়েছে হিন্দু হোমল্যান্ডের দাবি। গণহত্যা, ধর্ষণ-সহ সব রকমের হিংসা-সন্ত্রাস-বর্বরতার শিকার হয়েও বাংলাদেশের হিন্দুরা গত ২৬ আগস্ট জন্মাষ্টমীর দিনে রাজধানী ঢাকার বুকে বড়ো মাপের জমায়েত সংঘটিত করেছে। 'জয় শ্রীরাম' ও 'জয় শ্রীকৃষ্ণ' ধ্বনিতে মুখরিত হয়েছে ঢাকার রাজপথ।

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩১

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

থাকছে

দেবী প্রসঙ্গ, উপন্যাস
জীবনী, পুরাণ কথা,
বড়ো গল্প, ছোট গল্প
প্রবন্ধ

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা